জীবন-জীবিকায়নে ক্ষুদ্রঋণ

ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)

জীবন-জীবিকায়নে
ক্ষুদ্রঋণ

ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)

জীবন-জীবিকায়নে ক্ষুদ্রঋণ

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের উপকারভোগীদের সাফল্যগাঁথা সম্বলিত কিছু কেসস্টাডি

জুন ২০১৪

প্রকাশনায়
ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)
বাড়ি নং- ১৯, রোড নং- ১২ (নতুন)
ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা - ১২০৯

উপদেষ্টা
ড. এম. এহ্ছানুর রহমান

সম্পাদক
মোঃ আসাদুজ্জামান

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ রেজাউল ইসলাম

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
মোঃ আমিনুল হক

মুদ্রণ
শব্দকলি প্রিন্টার্স
৭০, বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা-১০০০

ISBN 978-984-91015-3-6

পাঠকের জন্য দ্রষ্টব্য

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সন থেকে মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সময়ের পরিক্রমায় মিশনের মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রম একটি টেকসই ও মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তার মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য "ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)" নামে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছে যা মিশনের একটি সামাজিক উদ্যোগ হিসেবে জুন ২০১৪ থেকে যাত্রা শুরু করেছে। তাই ডিএফইডি কর্তৃক প্রকাশিত জীবন-জীবিকায়নে ক্ষুদ্রঋণ সংকলনে উল্লেখিত কেস স্টাডিসমূহ মিশনের সার্বিক কার্যক্রমের প্রতিফলন হিসেবে বিবেচিত হবে।

সূচিপত্র

ফুল চাষ অঞ্জু সরকারের জীবনকে করেছে ফুলের মতোই প্রস্ফুটিত ০৭
মোঃ রেজাউল ইসলাম, সিঃ প্রোগ্রাম অফিসার

ক্রিকেট ব্যাটে বাসন্তির দারিদ্র্য জয় ০৯
মুহাম্মদ খায়রুল ইসলাম, সিঃ এরিয়া ম্যানেজার

মৎস্যচাষে স্বাবলম্বী সাবিনা ইয়াসমীন ১১
মোঃ রুহুল আমীন খান, এরিয়া ম্যানেজার

শীলা বেগম : বিক্রেতা থেকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ১৩
মোঃ তোফাজ্জল হোসেন, এরিয়া ম্যানেজার

কাঁকড়া চাষে সুজিত মন্ডলের ভাগ্য বদল ১৫
মোঃ শামীমুর রহমান, এরিয়া ম্যানেজার

দরিদ্র কিষাণী থেকে সফল লেবু চাষী সাবিনা আক্তার ১৭
মোঃ দিদারুল ইসলাম, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার

সফলতার অগ্রযাত্রায় শামিল এক তরুণ-রিয়াজুল ১৯
মোঃ ফারুক হোসেন, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার

মোমের আলোয় আলোকিত শাপলার জীবন ২১
বাঁধন কুমার বিশ্বাস, এরিয়া ম্যানেজার

পান চাষের মাধ্যমে স্বাবলম্বী আছিয়া খাতুন ২৩
মোঃ সেলিম হোসেন, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার

বাঁশ-বেতে সচ্ছলতার ভিত গড়ছেন উষা রানী ২৫
মোঃ নিয়ামুল কবির, প্রোগ্রাম অফিসার (কৃষি)

জীবিকায়নের চিত্র ২৭

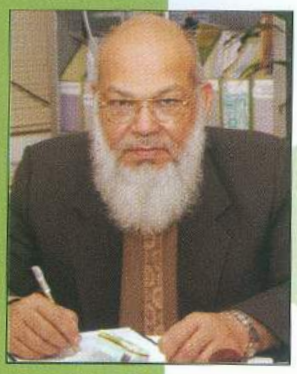

শুভেচ্ছা বার্তা

বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করে আসছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি টেকসই কর্ম-সৃজনের মাধ্যমেই দারিদ্র্য হ্রাস করা সম্ভব। তাই অভীষ্ট জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে স্ব ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সাল থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এই দুই দশকে দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয়-বৃদ্ধি ও সম্পদ অর্জনের মধ্য দিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মিশনের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন একটি বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে ক্ষুদ্রঋণ সেবা প্রদান ছাড়াও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবন-জীবিকা এবং মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার ইত্যাদি কর্মসূচির সমন্বয় ঘটিয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তার মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য "ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)" নামে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছে যা মিশনের একটি সামাজিক উদ্যোগ হিসেবে জুন ২০১৪ থেকে যাত্রা শুরু করেছে।

ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সময়োপযোগী ঋণসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিকে বহুমুখীকরণের ওপর সব সময়ই গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি বছর মিশন ইসলামী মাইক্রো-ফিন্যান্স নামে একটি নতুন ঋণসেবা চালু করেছে। এ ছাড়া ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতার বিষয়টি বর্তমানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আর্থিক ও অন্যান্য সেবা কার্যক্রমে ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। বিশেষতঃ চরাঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চল, বন্যা-প্রবণ অঞ্চল, হাওরাঞ্চল, মৌসুমী দারিদ্র্য-প্রবণ অঞ্চল ইত্যাদি পরিবেশগত নাজুক অঞ্চলগুলোর দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হচ্ছে, যা খুবই সময়োপযোগী। সম্প্রতি দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৪০টি উপজেলার দরিদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের জন্য USAID-এর আর্থিক সহযোগিতায় কৃষি সম্প্রসারণ সহযোগিতা প্রকল্পে ক্ষুদ্রঋণ সেবা যুক্ত করা হয়েছে, যা উক্ত এলাকার প্রায় ২ লক্ষ কৃষক পরিবারের জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ডিএফইডি কর্তৃক "জীবন-জীবিকায়নে ক্ষুদ্রঋণ" সংকলনটির ২য় সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। এই প্রকাশনাটিতে মিশনের ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের সাফল্যগাঁথা সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এ ছাড়াও এই প্রকাশনাটি মিশনের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের বৈচিত্র্যময় দিকগুলো পাঠকের কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। "জীবন-জীবিকায়নে ক্ষুদ্রঋণ" শীর্ষক প্রকাশনাটি আমাদের দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণের ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে এ ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় উৎসাহিত করবে বলে আমি আশা করি।

এ প্রকাশনাটিকে তথ্যবহুল ও সমৃদ্ধ করার জন্য ডিএফইডি-এর যে সকল কর্মকর্তা কাজ করেছেন তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির সকল পর্যায়ের কর্মীদেরকে তাদের কঠোর পরিশ্রম ও আন্তরিকতার জন্য জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

কাজী রফিকুল আলম
চেয়ারপার্সন

মুখবন্ধ

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত। অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং অন্যান্য সকল প্রকার বঞ্চনা থেকে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মানুষ যাতে মুক্ত হয়ে ও দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বের হয়ে এসে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি সাধন করতে পারে এবং এই ধারাবাহিকতায় মানবমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেজন্য ক্ষুদ্রঋণের ভূমিকা আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ১৯৯৩ সাল থেকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করে। প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় মিশন তার মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচিকে "ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)" নামে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেছে যা মিশনের একটি সামাজিক উদ্যোগ হিসেবে জুন ২০১৪ থেকে যাত্রা শুরু করেছে। জীবন-জীবিকা উন্নয়নের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সুযোগবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করে কৃষি বহুমুখীকরণ, উৎপাদনমুখী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন, মার্কেট লিংকেজ, বাজার চাহিদা সংশ্লিষ্ট বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টির ওপর জোর প্রদান করে। এ ছাড়াও উৎপাদনমুখী স্বকর্মসংস্থান ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব প্রদান করে মিশনের মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি গত দুই দশক ধরে দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে সুসংহতকরণ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ২০০৬ সালে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়। কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে পিকেএসএফ তার সহযোগী সংস্থাসমূহকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে। দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে সময়োপযোগী বহুমুখী ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে যা দরিদ্র ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ও ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখছে।

ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে একটি দরিদ্র পরিবার কীভাবে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠছে তার চিত্র প্রায়শই গণমাধ্যমগুলোতে সঠিকভাবে ওঠে আসে না। তাই ক্ষুদ্রঋণ কীভাবে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে অবদান রাখছে তা পাঠকের কাছে তুলে ধরার জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন "জীবন-জীবিকায়নে ক্ষুদ্রঋণ" শিরোনামে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের সাফল্যগাঁথা সম্বলিত কেস স্টাডি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। ইতোমধ্যে সংকলনটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। পূর্বের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বর্তমানে সংকলনটির ২য় সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমান সংকলনটিতে প্রকাশিত কেস স্টাডিগুলোয় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উৎপাদনমুখী কৃষিভিত্তিক সৃজনশীল কার্যক্রম ও ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোগসমূহে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সফলতার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। এ ছাড়াও উক্ত সংকলনটিতে মিশনের গণকেন্দ্রভিত্তিক কার্যক্রম ও শিক্ষিত বেকার তরুণ ও যুব সমাজের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির কথাও উল্লেখিত হয়েছে।

সংকলনটি প্রকাশের জন্য যে সকল কর্মকর্তা মাঠ পর্যায়ের বাস্তব কাহিনীসমূহ সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন এবং ডিএফইডি-এর যে সকল কর্মকর্তা সংকলনটি প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আশা করি সকলের সার্বিক সহযোগিতায় পরবর্তীতে প্রকাশনাটিকে আরো সমৃদ্ধ করে প্রকাশ করা সম্ভব হবে।

মোঃ আসাদুজ্জামান
এক্সিকিউটিভ হেড

ফুল চাষ অঞ্জু সরকারের জীবনকে করেছে ফুলের মতোই প্রস্ফুটিত

মোঃ রেজাউল ইসলাম, সিঃ প্রোগ্রাম অফিসার

পবিত্র ও শুদ্ধতার প্রতীক বলা হয় যে ফুলকে, সেই ফুল চাষ করে আজ সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে যশোরের কেশবপুর উপজেলার মূলগ্রামের অঞ্জু সরকার। ওই অঞ্চলের মানুষ যাকে ফুল বৌদি নামেই বেশি চেনে। যশোরের মানুষের কাছে অঞ্জু সরকার জীবন যুদ্ধে জয়ী এক সাহসী নারীর নাম। ফুলের ব্যবসার মাধ্যমে দারিদ্র্যকে জয় করে আজ তিনি একজন সফল নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। চলাচল করেন ব্যক্তিগত গাড়ি করে। অথচ মাত্র এক দশক আগেও রাস্তায় হেঁটে হেঁটে বিনা পয়সায় ফুল বিলি করেছেন তিনি। মানুষের কাছ থেকে বিরূপ মন্তব্যও শুনেছেন। কিন্তু দমে যাননি। শ্রম, সততা ও একাগ্রতা দিয়ে কাজ করে গেছেন।

ফুল বাগান থেকে ফুল আহরণ করছেন অঞ্জু সরকার

ফুল বৌদির জীবন-সংগ্রামের ইতিহাস শুনলে যেকোনো মানুষের মনকে নাড়া দেবে। বিয়ের পর স্বামীর ঘরে এসে দেখেন দুই-একটি হাঁড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই। স্বামী ছিলেন কৃষক। অবস্থা এতই করুণ ছিল যে, তিনবেলা তিন মুঠো খাওয়া জুটত না। জীবিকার তাগিদে সিদ্ধান্ত নিলেন, স্বামীর সঙ্গে মাঠে কাজ করার। কিন্তু মাঠে কাজ করে যে টাকা পাওয়া যেত, তা দিয়ে সংসার চলত না। এক পর্যায়ে বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে ঝিয়ের কাজ শুরু করেন তিনি। ধান কাটা, আখ কাটা হেন কাজ নেই, করা হয়নি। ক্ষুধার জ্বালা নিবারণে সব কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু অভাব-অনটনের কারণে এক পর্যায়ে বাধ্য হন স্বামী-সন্তান নিয়ে ভারত চলে যেতে। সেখানে গিয়ে এক দিদির বাড়িতে ওঠেন। দিদি তাকে একটি ফুলের খামারে ফুল শ্রমিক হিসেবে কাজের ব্যবস্থা করে দেন। কীভাবে ফুল চাষ হয়, চারা রোপন করা হয় এবং তা বিক্রি করা হয়, অঞ্জু সরকার এসব শেখেন সেখান থেকেই। ফুলচাষ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানলাভের পর অঞ্জু সরকার সিদ্ধান্ত নেন দেশে ফিরে ফুলের চাষ ও ফুলের ব্যবসা করবেন। ২০০৫ সালে মালিকের বাড়ি থেকে কিছু ফুলের চারা নিয়ে চলে আসেন কেশবপুরের নিজ গ্রামে। বাড়ির আঙ্গিনায় রোপন করেন সেই চারা। কিন্তু ফুল চাষে ভিত্তি স্থাপন হলেও একে ব্যবসায়িকভাবে সফল করার জন্য যে পরিমাণ অর্থের বিনিয়োগ করা প্রয়োজন তা তার ছিল না। এই অর্থের সংস্থান করার লক্ষ্যে প্রতিবেশীদের পরামর্শে একই বছর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহযোগিতায় কেশবপুরের নিজগ্রাম; মূলগ্রামে প্রতিষ্ঠিত আশ্রয় গণকেন্দ্রের সাথে সম্পৃক্ত হন অঞ্জু সরকার। তিনি জানতে পারেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

একটি স্বনামধন্য উন্নয়ন সংস্থা যা গণকেন্দ্রের মাধ্যমে সমাজে পিছিয়ে থাকা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সচেতনতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। অঞ্জু সরকার আরও জানতে পারেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত গণকেন্দ্র হতে বিভিন্ন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণের পাশাপাশি ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেদের ব্যাপৃত করার মাধ্যমে অনেক দরিদ্র মহিলা স্ব-কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

এরপরের ইতিহাসতো শুধুই গল্পের মতো। অঞ্জু সরকারের ফুল চাষের প্রতি আগ্রহ দেখে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। তাকে প্রাথমিকভাবে ২৫ হাজার টাকা ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে মিশন। ঋণের টাকার সাথে নিজের পারিবারিক কিছু সঞ্চয় এক করে নিজস্ব যতটুকু জমি ছিল, সেখানেই পুরো উদ্যোমে স্বামী সন্তোষ সরকার ও দুই ছেলেকে নিয়ে অঞ্জু সরকার বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শুরু করেন রজনীগন্ধা, গাঁদা, বেলি, ডালিয়া ও জিপসি ফুলের চাষ। জমিতে উৎপাদিত ফুল প্রথমে হাতে হাতে বিক্রি করতেন তিনি। পরে কেশবপুর বাজারে নিয়ে এসে বিক্রি শুরু করেন। পাশাপাশি পাশের উপজেলা ঝিকরগাছার গদখালি বাজার থেকে গোলাপসহ অন্যান্য ফুল কম দামে কিনে এনে তাও বিক্রি শুরু করেন অঞ্জু সরকার। এরপর বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে গায়ে হলুদসহ বিয়ের অনুষ্ঠান সাজানোর কাজও শুরু করেন তিনি। সঠিকভাবে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনও প্রতিবছর অঞ্জুর সরকারের ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। এভাবে প্রতিবছর পর্যায়ক্রমে ফুলচাষে লাভের টাকা ও মিশন থেকে ঋণের টাকায় অন্যের জমি লিজ নিয়ে ফুল চাষের পরিধি বিস্তার করেন তিনি।

ফুল চাষের প্রতি অঞ্জু সরকারের এমন আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখে কেশবপুর থানার তৎকালীন ওসি থানার সামনে পড়ে থাকা খালি জমিতে তাকে ফুল চাষের অনুমতি দেন। সেই জমি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অঞ্জু সরকারের কাছে লিজ দেয়া হয়। একই সঙ্গে কেশবপুর বাজারে একটি দোকান তৈরির অনুমতিও দেন ওই ওসি। এভাবেই "শুভেচ্ছা ফুল ঘর" নামে কেশবপুর বাজারে একটি ফুলের শো-রুম প্রতিষ্ঠা করেন অঞ্জু সরকার। তিনি এখন শুধু ফুলের ব্যবসাই করেন না, এর পাশাপাশি গায়ে হলুদ, বিয়ের অনুষ্ঠান, বাসর ঘর, হালখাতা, ভিআইপি ও রাজনীতিবিদদের অনুষ্ঠান সাজানোর কাজও করছেন। কেশবপুর উপজেলাসহ পুরো যশোর জেলা ও আশপাশের কোথাও কোনো অনুষ্ঠান হলেই ডাক পড়ে ফুল বৌদির। ফুল দিয়ে এক একটা অনুষ্ঠান সাজাতে সম্মানী বাবদ ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা পাচ্ছেন। আর নিজস্ব প্রাইভেট কার থাকায় বাড়তি সুবিধাও হয়েছে। কারণ, যেকোনো বিয়ের অনুষ্ঠান হলে বরযাত্রার গাড়ী ফুল দিয়ে সাজানো অবস্থায় একসঙ্গে পান গ্রাহকরা। ফলে সবাই ফুল বৌদির কাছে ছুটেন। বর্তমানে খুলনা ও সাতক্ষীরায় আরও দু'টি ফুলের দোকান দিয়ে অঞ্জু সরকার তার ব্যবসা সম্প্রসারণ করেছেন।

ফুল ব্যবসায় এরই মধ্যে প্রায় এক যুগ কেটেছে অঞ্জু সরকারের। দীর্ঘ এই পথ চলায় যে সাফল্য এসেছে তা এক কথায় অবিশ্বাস্য। এই সময়ে ফুল বিক্রির টাকা জমিয়ে কেশবপুর বাজারে চার শতক জমি কিনেছেন। যার বর্তমান বাজার মূল্য ১৪ লাখ টাকা। ছোট ছেলেকে পাঠিয়েছেন কুয়েত। শুধুমাত্র ফুল চাষের জন্য গ্রামে কিনেছেন ২৩০ শতক জমি। আর এইসব জমিতে উৎপাদিত ফুল বিভিন্ন জেলায় পৌঁছে দিতে কিনেছেন প্রাইভেট কার। চলাচল করেন ঐ প্রাইভেট কারেই। সাফল্যের এই পর্যায়ে আসার পরও ফুল বৌদি রয়ে গেছেন আগের মতোই নিরহংকার ও সাদাসিধে। তার চালচলনে আসেনি কোনো পরিবর্তন। ধ্যান-জ্ঞান ওই ফুল বিক্রি নিয়েই। ভোর বেলায় জমি থেকে ফুল তুলে তা নিয়ে আসেন দোকানে। আর বাড়ি যান সেই রাতে। অঞ্জু সরকার এখন দৈনিক ১৫ হাজার টাকার ফুল বিক্রি করেন। আর প্রতিবছর তাঁর ফুল বিক্রি হয় ৫৪ লাখ টাকা। এখান থেকে নিট লাভ থাকে ৬ লাখ টাকা। এদিকে অঞ্জু সরকারের এই ফুল ব্যবসায় কর্মসংস্থান হয়েছে স্কুল-কলেজে পড়ুয়া অনেক দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীর। অন্তত ২০ জন শিক্ষার্থী ও দরিদ্র নারী অঞ্জু সরকারের সঙ্গে কাজ করছেন। অঞ্জু সরকার ভবিষ্যত পরিকল্পনাও নিয়ে রেখেছেন। সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে চান ফুলের ব্যবসা। পাশাপাশি এই ফুল বিদেশেও রপ্তানি করতে চান। অঞ্জু সরকার ২০১৩ সালে তার ব্যক্তিগত ফুল ব্যবসার পাশাপাশি নিজ এলাকার নারী সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করার সম্মাননা হিসেবে পেয়েছেন জয়ীতা পুরস্কার। এ ছাড়া ২০১৪ সালে আয়োজিত নবম সিটি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পুরস্কার প্রতিযোগিতায় অঞ্জু সরকার শ্রেষ্ঠ কৃষি উদ্যোক্তা ক্যাটাগরিতে ২য় স্থান অধিকার করে জাতীয় পর্যায়ে বিরল সম্মান অর্জন করেন। সত্যিই ফুলচাষ অঞ্জু সরকারের জীবনকে করেছে ফুলের মতোই প্রস্ফুটিত।

অঞ্জু সরকার বর্তমানে স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখ-শান্তিতেই জীবন কাটাচ্ছেন। অঞ্জু সরকার যে দুঃখ-কষ্ট করেছেন, আর কাউকে যাতে তা সহ্য করতে না হয়, সেজন্য তিনি মেয়েদের কাজের সুযোগ করে দিচ্ছেন। অঞ্জু সরকার বলেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তার জীবন পরিবর্তনে সহযোগিতা করেছে। এজন্য কখনও তিনি সমিতি ছাড়বেন না। সেটা তিনি যত বড়ই হোন। আর এই পেশাও ত্যাগ করবেন না। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ফুল পেশায়ই থেকে যেতে চান এই সফল উদ্যোক্তা।

ক্রিকেট ব্যাটে বাসন্তির দারিদ্র্য জয়

মুহাম্মদ খায়রুল ইসলাম, সিঃ এরিয়া ম্যানেজার

যশোর জেলা সদরের কাশিমপুর ইউনিয়নের ডহরপাড়া গ্রামের বাসন্তি ক্রিকেট খেলা বোঝেন না। ক্রিকেটের এত নিয়ম-কানুনও জানেন না। দরিদ্র ঘরে জন্ম হলেও এইটুকু জানেন যে, বাংলাদেশে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা আজ আকাশছোঁয়া। দেখেছেন আশ-পাশের গ্রামসহ দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে ক্রিকেট। এই ক্রিকেট খেলার ব্যাট তৈরি করেই জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়েছেন বাসন্তি রাণী দাস। ২০০০ সালে তার ব্যাট তৈরি ও বিক্রির কাজ শুরু। আমদানি নির্ভর একটি পণ্যকে দেশীয় প্রযুক্তিতে সুলভমূল্যে দেশের তরুণ প্রজন্মের হাতে তুলে দিতে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে শ্রম দিয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই এক নাগাড়ে কাজ করে যাচ্ছেন। একযুগ পর বাসন্তি আজ একজন সফল নারী উদ্যোক্তা।

ক্রিকেট ব্যাটে স্টীকার লাগাচ্ছেন বাসন্তি রাণী দাস

বাসন্তি ও তার স্বামী অরুণ কুমারের ক্রিকেট ব্যাট তৈরির ব্যবসায় আসার গল্পটা একটু অন্যরকম। ২০০০ সনে সদ্য বিবাহিতা বাসন্তির অভাব-অনটনের সংসার। বাসন্তি প্রতিবেশীদের বাড়ি গিয়ে ঝিয়ের কাজ করেন। স্বামী অরুণ কুমার ফার্নিচারের দোকানে কাজ করেন। কিন্তু দুজনে মিলে যা উপার্জন করেন, তা দিয়ে সংসার চলে না। এরকম অবস্থায় পারিবারিক কারণে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে ২০০০ সালে খুলনার রূপদিয়ায় আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে যান। সেখানে গিয়ে তারা দেখেন কাঠের কারিগররা কীভাবে ক্রিকেট ব্যাট তৈরি করছে। তারা জানতে পারেন যে ক্রিকেট ব্যাট তৈরি একটি লাভজনক ও সম্ভাবনাময় উদ্যোগ। ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বাড়ার সাথে সাথে এই ক্রিকেট ব্যাটের চাহিদাও দিন দিন বেড়েই চলেছে। তাদের ক্রিকেট ব্যাট তৈরির হাতে খড়ি ওই রূপদিয়াতেই। বাসন্তি ও তার স্বামী অরুন কুমার উদ্বুদ্ধ হন এবং সিদ্ধান্ত নেন নিজ গ্রামে ফিরে তারা এই ক্রিকেট ব্যাট তৈরির কাজ শুরু করবেন। সেই থেকেই ক্রিকেট ব্যাট তৈরি ও বিক্রির কাজ শুরু।

খুলনার রূপদিয়া থেকে নিজ গ্রাম ডহরপাড়ায় ফিরে এসে ক্রিকেট ব্যাট তৈরির ব্যবসা শুরুর উদ্যোগ নেন বাসন্তি রাণী। এই উদ্যোগে বিনিয়োগের জন্য পুঁজি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বাসন্তি তাদের ডহরপাড়া গ্রামে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক

পরিচালিত "শিশির মহিলা উন্নয়ন সমিতি"র সদস্যদের সাথে আলোচনা করে উক্ত সমিতিতে সদস্য হন। পরবর্তীতে উক্ত "শিশির মহিলা উন্নয়ন সমিতি"র দায়িত্বপ্রাপ্ত মিশন কর্মীকে তার উদ্যোগের কথা জানালে তাকে প্রথম দফায় ১০ হাজার টাকা ক্ষুদ্রঋণ দেয়া হয়। সেই ঋণের টাকার সাথে নিজস্ব কিছু সঞ্চয় যোগ করে কদম, গেওয়া, আমড়া গাছের কাঠ কিনে তা দিয়ে প্রথম ব্যাট তৈরির কাজ শুরু করেন বাসন্তি ও তার স্বামী অরুন কুমার। এরপর তা বাড়ি বাড়ি ও হাট-বাজারে গিয়ে বিক্রি শুরু করেন। ব্যাট বিক্রি করে যা লাভ হতো, তা দিয়ে কোনোমতে সংসার চলতো। ধীরে ধীরে পরিচিতি বাড়তে লাগল বাসন্তির। এভাবে প্রতিবছর মিশন থেকে ঋণের সিলিং বৃদ্ধি করে ঋণ গ্রহণ করেন বাসন্তি এবং ঐ ঋণের টাকা দিয়ে ক্রিকেট ব্যাটের উৎপাদন বাড়াতে শুরু করেন। এভাবে তার ব্যবসা সম্প্রসারিত হয়। প্রথম দিকে টাকার অভাবে আগে ভালো কাঠ কিনতে পারতেন না। পর্যায়ক্রমে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন থেকে ঋণ নিয়ে জীবন কাঠসহ ভালো জাতের কাঠ কেনা শুরু করে গুণগতমান ঠিক রেখে টেকসই ক্রিকেট ব্যাট বানানোর দিকে সচেষ্ট হন তিনি। ভালো কাঠ দিয়ে ব্যাট বানালে তা অনেক টেকসই হয়। তা ছাড়া আগে ব্যাট তৈরিতে তেমন আধুনিক যন্ত্রপাতিও তার ছিল না। ঋণ নিয়ে পর্যায়ক্রমে আধুনিক যন্ত্রপাতিও কিনেছেন বাসন্তি। এখন অত্যন্ত সহজে ও কম সময়ে ব্যাট তৈরি করেন।

ক্রিকেটের মতো বাসন্তির ব্যাটের জনপ্রিয়তা ও চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। ডিসেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে ব্যাট যোগান দিয়ে শেষ করতে পারেন না তিনি। ওই সময়টায় ব্যাটের চাহিদা থাকে সবচেয়ে বেশি। কাশিমপুর গ্রামসহ আশপাশের ৩০/৪০ গ্রামের ক্রিকেটভক্তরা তার বাড়িতে এসে ভীড় জমান ব্যাটের জন্য। এছাড়া বাসন্তির হাতে তৈরি এই ব্যাট কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে চলে যায় রাজধানী ঢাকায়। একই সঙ্গে যশোর, পাবনা, নাটোর, খুলনা, মাগুরাসহ বিভিন্ন জেলার খেলার সরঞ্জাম বিক্রির দোকানে তা বাজারজাত করা হয়। তবে চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সরবরাহ করতে পারেন না বাসন্তি। এর প্রধান কারণ অর্থ সংকট। অর্থের সংস্থান করতে পারলে এই ব্যবসাকে আরও সম্প্রসারণ করার স্বপ্ন রয়েছে তার।

ক্রিকেট ব্যাট তৈরির জন্য বাসন্তির কারখানায় কোন সেকশনে কে কাজ করবেন, তা ভাগ করে দেয়া আছে। কেউ কাঠ সংগ্রহ করেন। সংগ্রহকৃত সেই কাঠ মিলে নিয়ে যান অন্য দল। মিল থেকে সেই কাঠ নিয়ে আসা হয় নিজস্ব কারখানায়। সেখানে আবার কাজ ভাগ করে দেয়া হয়। কেউ করেন ব্যাট জোড়া লাগানোর কাজ। আবার কেউ করেন স্টিকার লাগানোর কাজ। এভাবে গড়ে প্রতিদিন ৫০টি ব্যাট তৈরি করা হয়। আর মাসে তৈরি করা হয় এক হাজার ব্যাট। কারখানায় ছোট ও বড় দুই ধরনের ব্যাট তৈরি করা হয়। তবে বড় ব্যাটের চেয়ে ছোট ব্যাটের চাহিদাটা একটু বেশি। জীবন কাঠ, কদম, গেওয়া, ভেটুল, পিঠালী, আমড়া, ইপিলইপিল ও শিশু কাঠ দিয়ে এসব ব্যাট তৈরি করা হয়। চাহিদার ভিন্নতা থাকায় বর্তমানে সাত ধরনের ক্রিকেট ব্যাট তৈরি করেন বাসন্তি। ব্যাট তৈরি করে যে টাকা জমা করেছেন বাসন্তি তার সাথে প্রয়োজনীয় টাকা আগামী দফায় মিশন থেকে ঋণ নিয়ে উন্নতমানের একটি মেশিন কেনার উদ্যোগ নিয়েছেন। এখন যেখানে দিনে ৫০টি ব্যাট তৈরি হয়, সেই মেশিন দিয়ে কাজ করলে তখন গড়ে প্রতিদিন ১০০টি ব্যাট তৈরি করা সম্ভব হবে।

জীবনের পথ পরিক্রমায় বাসন্তি দারিদ্রতাকে পেছনে ফেলে এসেছেন অনেক আগেই। ঘরে সচ্ছলতা এসেছে। সন্তানদের পড়াশুনা করাচ্ছেন। ব্যাট তৈরির জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিও কিনেছেন। ১০ হাজার টাকা দিয়ে যে ব্যবসা শুরু করেছিলেন বাসন্তি, তাঁর সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ এখন দাঁড়িয়েছে দুই লাখ টাকায়। বাসন্তির হাতে তৈরি ব্যাট চলে যাচ্ছে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। অথচ এক যুগ আগেও অভাব-অনটনের মধ্যে না খেয়ে থাকতে হয়েছে তাঁকে। বাসন্তির এই ব্যাট ব্যবসা লাভজনক দেখে বাড়ির অন্যরাও উদ্বুদ্ধ হয়ে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছেন। বাসন্তির আত্মীয়-স্বজন মিলে ডহরপাড়া গ্রামে এখন প্রায় ৫০ জনের মতো এই ব্যবসায় যুক্ত আছেন। যারা আগে ফার্নিচার তৈরিসহ অন্য পেশায় জড়িত ছিলেন তারাও এখন এই ব্যবসায় যুক্ত হচ্ছেন। এ ছাড়া অনেকেই পড়াশুনার পাশাপাশি ক্রিকেট ব্যাট তৈরিতে খণ্ডকালীন সময় দিচ্ছেন। আবার স্থানীয় দরিদ্র গৃহবধুরাও গৃহস্থালী কাজের পাশাপাশি এই কাজে খণ্ডকালীন বা স্থায়ী কর্মী হিসেবে নিয়োজিত হচ্ছেন। আগে ডহরপাড়া গ্রামে যেখানে ক্রিকেট ব্যাট তৈরির একটিও কারখানা ছিল না, এখন সেখানে একে একে আটটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে ডহরপাড়া গ্রামটি এখন ক্রিকেট ব্যাট উৎপাদন ও বিপণনের একটি ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

আগামী বছর ক্রিকেট বিশ্বকাপ। বিশ্বকাপের জ্বরে থাকবে পুরো দেশ। সেই ক্রিকেট জ্বরকে কাজে লাগাতে চান বাসন্তি। বিশ্বকাপ ক্রিকেটকে সামনে রেখে বাসন্তির স্বপ্ন বিশাল। এই আয়োজনকে কেন্দ্র করে ব্যবসা আরও বাড়াতে চান। তিনি বিনম্র চিত্তে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান, প্রয়োজনের সময় আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে তার মতো অসংখ্য বাসন্তিকে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করার জন্য।

মৎস্যচাষে স্বাবলম্বী সাবিনা ইয়াসমীন

মোঃ রুহুল আমীন খান, এরিয়া ম্যানেজার

নেত্রকোনা জেলা সদরের বড় কাইলাটি গ্রামে যেতে চোখে পড়বে কিছুদূর অন্তর অন্তর ছোট, মাঝারি ও বড় বড় পুকুর। বেশিরভাগ পুকুরে পরিকল্পিতভাবে মাছ চাষ করা হয়। আগে যে পুকুরগুলো খালি পড়ে থাকতো সেগুলোও এখন মাছ চাষের আওতায়। এই বড় কাইলাটি গ্রামের মাস্টার্সে অধ্যয়নরতা একজন গৃহবধূ সাবিনা ইয়াসমীন। যিনি পরিকল্পিতভাবে মাছ চাষ করে আজ নিজেকে একজন আত্মনির্ভরশীল নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি করেছেন আরও অনেকের জন্যে কর্মের সংস্থান।

পুকুর থেকে আহরিত মাছ গ্রেডিং করছেন সাবিনা ইয়াসমীন

অথচ তিন-চার বছর আগেও সংসারের পরিস্থিতি ছিল প্রতিকূল। দুই ছেলে এবং শাশুড়ীসহ পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন। সাবিনার স্বামী মোঃ গোলাম মহিউদ্দিন খোকন বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের হিসাবরক্ষক হিসেবে চাকুরি করতেন। তার একার উপার্জনে সংসারে ৫ জনের খাওয়া-পরা কোনোরকমে চললেও সাবিনার পড়ালেখার খরচ জোগানো কঠিন হয়ে পড়ত। তাই পরিবারে অভাব অনটন লেগেই থাকত। মাঝে মাঝে অন্যের সাহায্য নিয়ে সংসার চালাতে হতো। মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ করেই ২০০৯ সালে বিয়ের পিঁড়িতে বসা মেধাবী সাবিনা বিয়ের পরও পড়ালেখা বন্ধ করেননি। স্বামীর সহযোগিতায় তিনি পড়ালেখা অব্যাহত রাখেন এবং স্বপ্ন দেখেন নিজ পরিবারের সুন্দর ভবিষ্যত গড়ার।

পরিবারের উপার্জন বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বামীর পাশাপাশি সাবিনা নিজেও কিছু কাজ করার জন্য মনস্থির করেন এবং উপায় খুঁজতে থাকেন। একজন শিক্ষিতা নারী হিসেবে সাবিনা জানতেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে অনেকেই আত্ম-কর্মসংস্থানের পথ খুঁজে নিচ্ছে। তাই সাবিনা ২০১১ সালে স্বামীর সাথে আলোচনা করে স্থানীয় যুব উন্নয়ন অধিদফতর থেকে মাছ চাষের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। কিন্তু মাছ চাষের জন্যে অর্থের জোগান আসবে কোত্থেকে? এই চিন্তায় সাবিনা যখন উদ্বিগ্ন তখন পাশের বাড়ির মহিলাদের মাধ্যমে জানতে পারেন, বড় কাইলাটি গ্রামে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সমাজের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন এবং জীবন-জীবিকা উন্নয়নের

লক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। অত্র এলাকার অনেক মহিলাই মিশনের ক্ষুদ্রঋণ এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হয়ে কাঙ্ক্ষিত সফলতা পেয়েছেন। জেলি মহিলা উন্নয়ন সমিতি নামে সাবিনাদের গ্রামে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি সমন্বিত সমিতি ছিল। সমিতির অন্য সদস্যদের পরামর্শে ২০১১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সাবিনা এই সমিতির সদস্য হন।

এরপর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন থেকে প্রথমবার ৩০ হাজার টাকা ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে এবং নিজস্ব পারিবারিক কিছু পুঁজি বিনিয়োগ করে নিজের পুকুরে শিং, পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া মাছের পোনা ছাড়েন সাবিনা। মাছের খাবার, শ্রমিকের খরচ, ঋণের কিস্তিসহ সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে প্রথমবার মাছ চাষে প্রায় ৫০ হাজার টাকা আয় হয়। প্রথমবার মাছ চাষে সফলতা পাওয়ায় তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি দ্বিতীয় দফায় আরেকটি পুকুর লিজ নিয়ে প্রথমবার লাভের টাকা এবং মিশন থেকে দ্বিতীয় দফায় আরও ৫০ হাজার টাকা ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে মাছ চাষের প্রকল্প সম্প্রসারণ করেন। এভাবে পঞ্চাশ শতক পরিমাণ পুকুরে মাছ চাষ শুরু করে বর্তমানে তিনি ১২০ শতক জমির পুকুরে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ করেছেন।

সাবিনা ইয়াসমিন এখন বছরে তিনবার পুকুরে মাছ চাষ করেন। বর্তমানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন থেকে ৪র্থ দফায় ১ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে এ বছরের ২৩ মার্চ পঞ্চাশ শতাংশ পরিমাণ জমির পুকুরে ৩৮০ কেজি বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা ছেড়েছেন। মাছ বিক্রির সময় হবে জুন মাসে। পাশের আরো দু'টি পুকুরেও মাছ ছেড়েছেন তিনি। মাছের খাবার ও অন্যান্য খরচসহ সবমিলিয়ে খরচ হবে চার লাখ টাকা। তাতে প্রায় সাত লাখ টাকার ওপরে মাছ বিক্রি করবেন বলে সাবিনার প্রত্যাশা।

এভাবেই পরিকল্পিতভাবে মাছ চাষ করে মাস্টার্সে অধ্যয়নরত সাবিনা ইয়াসমিন আজ লক্ষপতি এবং স্বাবলম্বী। সংসারে আর অভাব অনটন নেই। জয় করেছেন দরিদ্রতাকে। মাছ চাষ করে লাভের টাকায় বাড়িতে বসিয়েছেন সাবমারসিবল পাম্প। যা দিয়ে তিনি পুকুরে পানি সরবরাহ করেন। পাশের আরো দু'টি পুকুর অন্যের কাছ থেকে লিজ নিয়ে মাছ চাষ করছেন। পাকা ঘরবাড়ি তৈরির কথা ভাবছেন। এখন আগামী বছরের মধ্যে আট বিঘা সমপরিমাণ পুকুরে মাছ চাষের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়া কয়েকমাসের মধ্যেই বাড়ির উঠানে টিনের শেড তৈরি করে মুরগি পালন শুরু করবেন বলেও ভাবছেন তিনি। ইতোমধ্যে আরও পরিকল্পিতভাবে মাছের খামার উদ্যোগটিকে সম্প্রসারণে সাবিনাকে সহযোগিতা করার জন্য স্বামী মোঃ গোলাম মহিউদ্দিন খোকন ব্র্যাকে হিসাবরক্ষকের চাকুরি ছেড়ে তার সাথে যুক্ত হয়ে কাজ শুরু করেছেন। সাবিনার স্বামী খোকন বড় সাইজের মাছ চাষের পাশাপাশি একটি পুকুরে মাছের পোনা বড় করেন। মাছের ছোট পোনা কিনে নিয়ে সেখানে একটু বড় করে তোলেন। এ থেকেও তিনি ভালো অঙ্কের টাকা মুনাফা পান। মাছের একেকটি পোনা ৪০ পয়সা দরে কিনে তা বড় করে ৪-৫ টাকায় বিক্রি করে থাকেন।

সাবিনা আজ একজন সফল মৎস্যচাষী হিসেবে তার এলাকায় পরিচিতি পেয়েছেন। মাছ চাষের মাধ্যমে তিনি পরিবারের সচ্ছলতা এনেছেন। একসময়ের অভাবী সাবিনা নিজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, বুদ্ধি ও পরিশ্রমের মাধ্যমে তার জীবনের মোড় ঘুরিয়েছেন। নিজের ও স্বামীর স্ব-কর্মসংস্থানের পাশাপাশি তিনি সৃষ্টি করেছেন আরও অনেক দরিদ্র পরিবারের জন্য কর্মের সংস্থান। অভাব এখন আর তার পিছু তাড়া করে না। শুধু তাই নয়, তার মাছ চাষের প্রকল্পকে অনুসরণ করে গ্রামের অনেকেই আগ্রহী হয়ে মাছ চাষ শুরু করেছেন। দারিদ্র্যকে কীভাবে জয় করতে হয় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন সাবিনা ইয়াসমিন।

সবকিছুর ওপর সাবিনা ইয়াসমিন বিশ্বাস করেন শিক্ষাই তার আজকের সফলতার অন্যতম ভিত্তি। এই শিক্ষাই তাকে সচেতন করেছে একজন স্বাবলম্বী নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে। এ ছাড়াও দরিদ্র ও শিক্ষিত যুবসমাজকে ক্ষুদ্র উদ্যোগী হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে সহজ শর্তে ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা প্রদান করার জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং এরকম অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেন তিনি। আগামীতে তিনি তার দু'টি ছেলে সন্তানকে সু-শিক্ষায় শিক্ষিত এবং সমাজে সু-নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন।

শীলা বেগম : বিক্রেতা থেকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা

মোঃ তোফাজ্জল হোসেন, এরিয়া ম্যানেজার

চোখে স্বপ্ন, বুকে আশা নিয়ে ২০০৬ সালে মাত্র ২০০ টাকা দিয়ে অন্যের কারখানা থেকে আইসক্রিম কিনে এনে তা বিক্রি শুরু করেন। পরে নিজের প্রচেষ্টায় গড়ে তোলেন একটি আইসক্রিম কারখানা। এখন মাসে আয় ৫০ হাজার টাকা। শুধু তাই নয়, নিজের কারখানায় ৫ জন দরিদ্র লোকের পূর্ণকালীন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি আইসক্রিম বিক্রয় ও বাজারজাত করার কাজে সৃষ্টি করেছেন আরো ২৫ জনের খণ্ডকালীন কর্মসংস্থান। গৃহিনী থেকে হয়েছেন একজন সফল নারী ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা। এই সফল উদ্যোক্তা হলেন নরসিংদী সদরের ঘোড়াদিয়া গ্রামের শীলা বেগম।

আইসক্রিমের তৈরিকৃত মিক্সার ডাইসে ঢালছেন শীলা বেগম

মাত্র আট বছর আগের কথা। আর দশ জন মহিলার মতো শীলা বেগম ছিলেন সাধারণ একজন গৃহিনী। তবে তিনি সাধারণ থাকেননি। স্বামীর আয়ে সংসার চালানো খুবই কষ্টকর ছিল। তাই শিলা বেগম ভাবতে থাকেন কি করে সংসারে কিছু বাড়তি আয়ের সংস্থান করা যায়। কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। কোনো হাতের কাজও জানেন না যে তা দিয়ে কিছু শুরু করবেন। তাছাড়া তেমন কোনো পুঁজিও তার ছিল না, যা দিয়ে তিনি কোনো ব্যবসা শুরু করতে পারেন।

নিজের সংসারের অভাব অনটনকে পিছনে ফেলে সংসারে সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে নিজের হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেন আইসক্রিমকে। শুরুতে অন্যের কারখানা থেকে আইসক্রিম কিনে এনে অল্প লাভে তা বিক্রি করা শুরু করেন। পাইপ আইসক্রিম এনে তা কেটে বিক্রি করতেন। কম পুঁজিতে লাভ একেবারেই কম ছিল না। এভাবে প্রায় দুই বছর চলে পাইপ আইসক্রিম বিক্রি। ইতোমধ্যে নিজের পরিশ্রমের ফল পেতে শুরু করেছেন তিনি। একাজে তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায় কয়েকগুণ। ভালো লাভ দেখে নিজেই একটা কারখানা প্রতিষ্ঠা করার কথা চিন্তা করেন শীলা বেগম। সিদ্ধান্ত নেন আর পরের কাজ নয়। নিজেই আইসক্রিম কারখানা করবেন। নিজের বানানো আইসক্রিম নিজেই বিক্রি করবেন। কিন্তু আবারো সেই পুঁজির সমস্যা। কারখানা করতে তো অনেক টাকা লাগে। এতো টাকা কোথায় পাবেন তিনি। চিন্তায় পড়ে যান। তবে কি তার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে, বাস্তবে ধরা দেবে না। ঠিক এসময় তাকে আশার আলো দেখায় ঢাক

আহ্ছানিয়া মিশনের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি। মিশন কর্মীর পরামর্শে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত স্থানীয় ঘোড়াদিয়া সবুজ মহিলা উন্নয়ন সমিতির সদস্য হন তিনি। নিজের স্বপ্ন পূরণের প্রথম ধাপে মিশন থেকে ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ছোট পরিসরে আইসক্রিম কারখানার কাজ শুরু করেন। অদম্য সাহস আর নিরলস পরিশ্রমের ফলও পান। নিজের কারখানায় উৎপাদিত আইসক্রিম বিক্রি করে ভালোই আয় হতে থাকে। এর মাঝে প্রতি সপ্তাহে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে থাকেন তিনি। এভাবে প্রথম বছর ঋণ শোধ করে প্রাপ্ত লাভের পুরোটাই কারখানার উন্নয়নে কাজে লাগান। পরের বছর লাভের টাকার সঙ্গে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন থেকে আরো ৩০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে কারখানার পরিসর বাড়ান। সেই ঋণ শোধ করে ২০০৮ সালে আরো ৪০ হাজার টাকা ঋণ নেন। এভাবে ৫০ হাজার টাকা, ৬০ হাজার টাকা, ৮০ হাজার টাকা করে ঋণ গ্রহণ বাড়তে থাকে। এভাবে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে তার ব্যস্ততা ও কারখানার কলেবর বৃদ্ধি। কয়েক বছরে নিজের লাভের টাকা, ঋণ ও পরিশ্রমে আজ তার কারখানা চলনসই আকার ধারণ করে। সর্বশেষ বছর মিশন থেকে আড়াই লাখ টাকা ঋণ নিয়ে আইসক্রিম বানানোর নতুন একটি মেশিন কেনেন তিনি। এ ঋণও শোধ হবার পথে।

শীলা বেগম নিজে সারাদিন কারখানায় কাজ করেন। পাশাপাশি তার স্বামীও একাজে তাকে বেশ সাহায্য করেন। চাহিদা বেশি থাকলে স্বামী ও সন্তানেরা তার কাজে হাত লাগান। তবে নিজের কারখানার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব তার হাতে। কাঁচামাল কেনা, মিশ্রণ তৈরি করা, তদারকিসহ সব কাজ করেন তিনি নিজেই। শীলা বেগমের কারখানায় চকবার, কুলফি, অরেঞ্জসহ ৮-১০ ধরনের আইসক্রিম তৈরি হয়। প্রতিদিন ৯-১০ হাজার আইসক্রিমের চাহিদা থাকে। গরমের উপর নির্ভর করে পরিমান কম বেশি হয়। গরম বেশি পড়লে চাহিদা বেড়ে যায়। তখন সারারাত ধরে আইসক্রিম বানাতে হয়। কারখানায় কাজ করা ৫ জন শ্রমিককে মাসে ২৫ হাজার টাকা বেতন দেন তিনি। সঙ্গে থাকা খাওয়া ফ্রি। এছাড়া আইসক্রিম বিক্রিতে নিয়োজিতরা কাজ করেন কমিশনে। শতকরা ২০ শতাংশ কমিশন পান বিক্রেতারা।

শীলা বেগমের ২০০ টাকার পুঁজি নিজের পরিশ্রম ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহায়তায় বর্তমানে ২০ লাখ টাকা ছাড়িয়ে গেছে। কারখানায় রয়েছে ১৫ লাখ টাকার অধিক দামের মেশিনারিজ। এছাড়া আইসক্রিম তৈরির মেশিন চালাতে বেশি ভোল্টের বিদ্যুৎ প্রয়োজন। তাই এ বছর ৩ লাখ টাকা খরচ করে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়েছেন শীলা বেগম। তবু ঘন ঘন লোড শেডিংয়ের কারণে কারখানার উৎপাদন ব্যহত হয়। এর সমাধান একটা জেনারেটর কেনা। তাই এবছর লাভের টাকা ও মিশন থেকে ঋণ নিয়ে একটি জেনারেটর কেনার পরিকল্পনা রয়েছে তার।

স্বামী ও তিন সন্তান নিয়ে শীলা বেগমের ছোট্ট সুখের সংসার। স্বামী আগে বিদেশে থাকতেন। এখন ব্যবসায় তাকে সাহায্য করছেন। তিন সন্তানের মধ্যে বড় ছেলে ও বড় মেয়ে পড়ে নবম শ্রেণিতে। আর ছোট ছেলে সবে দ্বিতীয় শ্রেণিতে উঠেছে। সংসারের সচ্ছলতার পাশাপাশি নিজের সন্তানদের আরো অনেক দূর নিয়ে যাবেন বলে স্বপ্ন দেখেন তিনি।

শীলা বেগম জানান, কারখানার আয়ে নিজের সংসার খরচের পাশাপাশি ঘরে সোফা, টিভিসহ নানান আসবাবপত্র কিনেছেন। কারখানার ঘরটি পাকা করেছেন। একই সঙ্গে কারখানার পাশের খালি জায়গায় ২ লাখ টাকা ব্যয়ে দু-রুমের পাকা ঘর তৈরি করেছেন। এখান থেকে মাসে ভাড়া বাবদ পান ২ হাজার টাকা। তার কারখানায় মানুষের জন্য ক্ষতিকর এমন কোন রাসায়নিক তিনি ব্যবহার করেন না। বানানো আইসক্রিম তিনি এবং তার ছেলেমেয়েরা সবাই খান। তবে এখানেই থেমে যেতে চান না শীলা বেগম। উপযুক্ত সহায়তা পেলে এ কারখানা আরো বড় পরিসরে স্থাপন করার স্বপ্ন দেখেন তিনি। সেই সঙ্গে ছেলে মেয়েদের মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলতে চান।

শীলা বেগম জানান শুধু তিনি একা নন, তার মতো আরো অনেকের পাশেই দাঁড়িয়েছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। সংস্থাটির ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি অনেককেই নতুন করে বাঁচতে শিখিয়েছে। এখান থেকে ঋণ নিয়ে কেউবা তার মতো শীলা বেগম হয়ে উঠছেন, কেউ নিজের ব্যবসা বড় করছেন, কেউ দোকান নিয়ে বসেছেন, আবার কেউ কৃষি কাজে সফলতা পেয়েছেন। নিজের ভাগ্যের পরিবর্তনের পাশাপাশি করেছেন অন্যের কর্মের সংস্থান।

কাঁকড়া চাষে সুজিত মন্ডলের ভাগ্য বদল

মোঃ শামীমুর রহমান, এরিয়া ম্যানেজার

সাতক্ষীরার আইলা দুর্গত এলাকায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য নিয়ে কাঁকড়া চাষে অভাবনীয় সফলতা অর্জন করেছেন শ্যামনগর উপজেলার নূরনগরের সুজিত মন্ডল (৪০)। জীবনটাকে বদলানোর স্বপ্ন নিয়ে কাঁকড়া চাষে নেমেছিলেন সুজিত মন্ডল। আজ তিনি কাঁকড়া চাষের মাধ্যমে পরিবারের অভাব দূর করে হয়েছেন স্বাবলম্বী। নিশ্চিত করেছেন সমাজে নিজের অবস্থান।

দারিদ্র জয়ের এ পথের শুরুটা কিন্তু মসৃন ছিল না। কাজের সন্ধানে ১৯৯৬-৯৭ সালে কক্সবাজারে গিয়ে দালালের খপ্পরে পড়ে ১৮ জনের দলের সাথে বিক্রি হয়ে যান সুজিত মন্ডল। পরে একজনের সাহায্য নিয়ে কোনোভাবে গ্রামে ফিরে এসে

কাঁকড়া গ্রেডিং করে বিক্রয়ের জন্য বাছাই করছেন সুজিত মন্ডল, ইনসেটে কাঁকড়া

মানুষের জমিতে কামলার কাজ করে কোনোরকমে দিনাতিপাত করছিলেন। ২০০৯ সালে তিনি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতাধীন যমুনা সমিতিতে অন্তর্ভূক্ত হয়ে কাঁকড়া চাষের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এরপর মিশন থেকে ঋণ নিয়ে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ ব্যবসা শুরু করেন। এরপর আর তাকে পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। তিনি বলেন, এক সময় এই পেশাকে নিচু মনে হতো, কাঁকড়া হারাম বলে অনেকে এই ব্যবসায় আসতো না। তবে, এখন আর এমনটা হয় না। কাঁকড়ার অনেক দাম হওয়ায় অনেকেই এখন এই ব্যবসায় এগিয়ে এসেছে ও সফলতা পেয়েছে। এক সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে যারা আমার সাথে অন্যের কামলা দিতো, তাদের অনেকেরই এখন আমার খামারে কর্মসংস্থান হয়েছে।

সুজিত মন্ডলের খামারের কাঁকড়ার চাহিদা ব্যাপক। স্থানীয় কাঁকড়া ডিপো মালিকরা তার কাছ থেকে কাঁকড়া কেনার জন্য আগাম টাকা দিয়ে রাখেন। তার খামারে সর্বোচ্চ ১ কেজি ২০০ গ্রাম ওজনের সোনালী কাঁকড়া রয়েছে। কেজিপ্রতি এই কাঁকড়া ১২শ' থেকে ১৩শ' টাকায় বিক্রি হয়। কাঁকড়ার খাবার সম্পর্কে সুজিত জানান, কাঁকড়া সব ধরণের নষ্ট

খাবার খায়। তবে, তিনি কাঁকড়ার খাবার হিসেবে তেলাপিয়া মাছ খাওয়ান। কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ ব্যবসা করে পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে বছরে প্রায় ৬০/৭০ হাজার টাকা থাকে তার।

তবে এ ব্যবসায় হতাশাও আছে বলেও উল্লেখ করেন সুজিত। তিনি বলেন, ব্যবসা সময় সবসময় এক রকম যায় না। শীতকালে কাঁকড়া খুব একটা থাকে না। তখন নতুন করে ঋণ নিয়ে চলতে হয়। তিনি জানান, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নূরনগর ব্রাঞ্চের শাখা ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প থেকে প্রতিবছর এ সময় তিনি ক্ষুদ্রঋণ নেন। আবার ব্যবসার অবস্থা ভালো হলে পরিশোধ করে দেন। এই ঋণ ব্যবসার প্রসারে তাকে অনেকটা সহযোগিতা করছে বলে জানান। একই সঙ্গে এজন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। যদিও সুজিত মন্ডল এ বছর এখনও ঋণ নেননি। গত বছর তিনি আহ্ছানিয়া মিশনের ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প থেকে ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন বলে জানান। এ বিষয়ে আরও উন্নত প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারলে কাঁকড়া মোটাতাজা করে অধিকতর লাভবান হওয়া সম্ভব বলে মনে করেন তিনি।

কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ ব্যবসার প্রসার সম্পর্কে সুজিত বলেন, প্রথম ১০ শতাংশ জমিতে কার্যক্রম শুরু করেন তিনি। আস্তে আস্তে ব্যবসার প্রসার বাড়ে। বর্তমানে ৫ একর জমিতে কাঁকড়ার চাষ করছেন। নিজের ৪ বিঘা বাদে অন্যের জমি লিজ নিয়ে কাঁকড়া চাষ করছেন। তিনি জানান, কাঁকড়ার দাম কেজি প্রতি সর্বনিম্ন ৩০০ এবং সর্বোচ্চ ১২০০ টাকা। তবে, প্রায় ১০টি গ্রেডের ভিত্তিতে কাঁকড়ার দাম নির্ধারণ করা হয়। ওজন অনুপাতেও এর দাম নির্ধারিত হয়। একই সঙ্গে ছোট কাঁকড়া ঘেরে দেয়া হয় না। কারণ এতে লাভ কম। এমনকি খরচও উঠে না। তাই ২০০ গ্রাম ওজনের কাঁকড়া ঘেরে দেয়া হয়। যা প্রথমাবস্থায় ২০০ থেকে ৩০০ টাকা কেজিতে কিনতে হয়।

তিনি বলেন, এক সময় এলাকায় একাই ব্যবসা করতাম। বিক্রি নিয়ে ঝামেলায় পড়তে হতো। শুধুমাত্র শুক্রবার কাঁকড়া বিক্রি হতো। এমন কি পাইকারদের বাড়িতে গিয়ে কাঁকড়া দিয়ে আসতে হতো। এখন অনেকে এ ব্যবসায় জড়িত হয়েছেন। এখন কাঁকড়া বিক্রি নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে হয় না। তার বাড়িতেই পাইকাররা আসেন কাঁকড়া কেনার জন্য।

সুজিত আরও বলেন, বেশিরভাগ কাঁকড়া বিদেশেই রপ্তানি করা হয়। তবে পা ভেঙ্গে গেলে অনেক সময় কাঁকড়া বিক্রি হয় না, সেগুলো খাওয়া হয়। তিনি আরও বলেন, গতবছর এবং এ বছরের শুরুর দিকে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং হরতালের কারণে কাঁকড়া ব্যবসায় ধ্বস নেমেছে। বর্তমানে অবশ্য পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। বাজার ফিরেছে। এখন ভালো অবস্থা বলেও জানান তিনি।

শুধু সুজিত নয়; সুজিতের মতো এলাকার অনেকেই এখন অত্যন্ত লাভজনক এই কাঁকড়া মোটাতাজাকরণে ঝুঁকছেন। এভাবেই শ্যামনগর ও আশাশুনি উপজেলার অসহায় ও দরিদ্র নারী-পুরুষেরা গড়ে তুলেছেন অসংখ্য কাঁকড়ার খামার। আর এসব খামারের উৎপাদিত কাঁকড়া রফতানি হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। কম সময়ে বেশি লাভ। তাই দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বাড়ছে কাঁকড়া চাষ। প্রতিবছর অর্জিত হচ্ছে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা। সুজিত মন্ডলের মতে, এলাকা থেকে অভাব কিছুটা হলেও তাড়িয়েছে কাঁকড়া। যার কিছু নাই সেও একটা কাঁকড়া খুঁজে বাজারে বিক্রি করে দৈনিক চাহিদা মিটাচ্ছে। কাঁকড়া মোটাতাজা করে এ অঞ্চলের অনেকেই প্রতিমাসে ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা আয় করে থাকে। তাই, কাঁকড়ার খামার আরো বাড়াতে পারলে এলাকার দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

সুজিত মন্ডল বর্তমানে আর্থিকভাবে একজন সচ্ছল ব্যক্তি। স্ত্রী ও একমাত্র সন্তান সুস্মিতা মন্ডলকে (৪) নিয়ে খুব ভালোভাবে সংসার চলছে তার। তার সাফল্যের অভিজ্ঞতা বর্ণনাকালে কৃতজ্ঞতা সহকারে তিনি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কথা স্মরণ করেন। মিশন তাকে সহজ শর্তে দফায় দফায় ঋণ সহযোগিতা করেছে, তাকে উৎসাহ দিয়েছে। সুজিত এখন যথেষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ী, আত্ম-বিশ্বাসী। ভবিষ্যতে তিনি তার উদ্যোগকে সম্প্রসারণের মাধ্যমে আরও অনেক দরিদ্র মানুষের বেকারত্ব দূর করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে চান।

দরিদ্র কিষাণী থেকে সফল লেবু চাষী সাবিনা আক্তার

মোঃ দিদারুল ইসলাম, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার

নরসিংদী সদরের হোগলা কান্দির এক দরিদ্র কিষাণী সাবিনা আক্তার। স্বামীর অসচ্ছল সংসারে একমাত্র আয়ের পথ কৃষি কাজ। তা দিয়েই পরিবারের খরচ চলে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্তই অপ্রতুল। তাই মনে মনে পথ খোঁজেন নিজে কিছু করার, সংসারে কিছু বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করার। সেই ভাবনা থেকেই শুরু হয় দারিদ্র্য জয়ের নতুন পথযাত্রার।

২০০৭ সালের কথা। ঐবছর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্থানীয় ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালিত হোগলা কান্দি পায়রা মহিলা উন্নয়ন সমিতিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হন সাবিনা। সংসারের প্রয়োজন মেটাতে কৃষি কাজের জন্য মিশন থেকে প্রথমে

লেবু বাগানে লেবুর পরিচর্যা করছেন কিষাণী সাবিনা আক্তার

১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে বসত ভিটায় কৃষি কাজ শুরু করেন তিনি। একেক মৌসুমে একেক ফসল ফলান। কখনো মরিচ, কখনো লাউ, পাট, আলু। ঋণের টাকায় চাষ করে পরে তা শোধ করেন। এভাবে চলে সংসার। বছরে বছরে চাষের জন্য ঋণ গ্রহনের পরিমানও বাড়তে থাকে। যেমন, দ্বিতীয় বছর ১৫ হাজার টাকা, তার পরের বছর ২৫ হাজার টাকা। এভাবে প্রায় ৫-৬ বছর চলে কৃষি কাজ। সংসারের আয় সামান্য বাড়লেও তা দিয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু হয় না। এমন অবস্থায় মিশনের কৃষি কর্মকর্তা তাকে উন্নত প্রযুক্তিতে বাণিজ্যিক মূল্য বেশি এমন ফসল উৎপাদনের পরামর্শ দেন এবং স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা নেয়ার কথা বলেন। উন্নত কৃষি প্রযুক্তিতে লেবু চাষে স্থানীয় অন্য লেবু চাষীদের সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাবিনা সিদ্ধান্ত নেন তিনিও লেবু দিয়েই তার দারিদ্র্যতাকে জয় করবেন। তাই সাবিনা ঠিক করেন অন্য ফসল চাষ করলেও লেবুর বাণিজ্যিক চাষে যাবেন তিনি। কিন্তু পুঁজি একটি বড় সমস্যা। লেবুর বাগান প্রস্তুত, গাছ কেনা, পরিচর্যার খরচ সব মিলিয়ে অনেক টাকার প্রয়োজন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্থানীয় কর্মকর্তার সঙ্গে তার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন তিনি। মিশন কর্মকর্তা সাবিনাকে ঋণের বিষয়ে আস্বস্থ করেন। সেখান থেকেই অভাব অনটনকে পিছনে ফেলে সচ্ছলতার পথে যাত্রা শুরু হয় সাবিনার। শুরু হয় একজন দরিদ্র কিষানী থেকে সফল লেবু চাষী হয়ে উঠার গল্প।

নিজের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে ২০১২ সালের মাঝামাঝিতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন থেকে নতুন করে ঋণ নেন সাবিনা। স্থানীয় এক চাষীর কাছ থেকে ৫০ টি লেবু চারার কলম এনে তার জমিতে লাগান। প্রতিটি কলমের পিছনে খরচ পড়ে ১০০ টাকা। দিন-রাত নিজের বাগানে কাজ করেন। পাশাপাশি চলে অন্যান্য ফসলের আবাদ। নিজের অক্লান্ত পরিশ্রমে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে গাছ। চিন্তা করেন, বাগান আরো বড় করবেন। তবে এবার আর অন্যের কাছ থেকে চারা কেনা নয়। নিজের লেবু গাছেই কলম করেন তিনি। নিজ হাতে তৈরি কলম থেকেই নতুন বাগান করেন তিনি। এখন তিন-তিনটি বাগান তার। সব মিলিয়ে মোট গাছের সংখ্যা ২০০টির বেশি। মোট ২০ গণ্ডা জমি জুড়ে তার লেবুর বাগান। লেবু গাছের ফাঁকে ফাঁকে খালি জায়গায় অন্যান্য সবজির চাষও থেমে নেই।

নিজের বাগানের পরিচর্যায় সবসময় ব্যস্ত থাকেন সাবিনা। আগাছা পরিস্কার, সার প্রয়োগ, ডাল-পালা ছাটা, পানি দেয়াসহ সব কাজ করেন নিজের হাতে। তার পরিচর্যা পেয়ে গাছগুলোও দেখতে হয়েছে বেশ। প্রায় প্রতিটি গাছেই ঝুলছে থোকা থোকা লেবু। লেবু তো নয় এ তো সাবিনা আক্তারের দারিদ্র্য জয়ের হাতিয়ার। তিনি, তার স্বামী ও সন্তানেররা সবাই সময় পেলেই বাগানের পরিচর্যা করেন। শুধু গাছ লাগালেই হয় না। গাছ থেকে ফল পেতে চাই যত্ন।

২০১২ সালে লেবু চাষ শুরু করার পর থেকে ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায় সাবিনা আক্তারের। গত দু'বছরে আশাতীত ফলন ও লভ্যাংশ ঘরে তুলেন তিনি। এবছরও তার পরিশ্রমের ফল আসবে হাতে। আগামী ৩-৪ মাস লেবুর ভরা মৌসুম। বাগানের লেবুর চাষ থেকে ৩ লাখ টাকা আয়ের স্বপ্ন দেখেন তিনি। তার বাগান থেকে প্রতি সপ্তাহে ৩০-৩৫ হাজার টাকার লেবু বিক্রি হবে। এভাবে ৩ মাসে ১২ সপ্তাহে প্রায় সাড়ে ৩ লাখ টাকা থেকে ৪ লাখ লেবু বিক্রি হবে। সব খরচ বাদ দিয়ে লাভ থাকবে আড়াই লাখ টাকা। এখানেই শেষ নয়। বাড়তি আয়ের পথ হিসেবে লেবুর পাশাপাশি লেবুর চারা কলমও বিক্রি করছেন তিনি। গত বছর নিজের বাগানে লাগানোর পরও ৫০ টি চারা কলম বাড়তি ছিল। সেগুলো বিক্রি করে কিছু টাকা হাতে পান তিনি। এবছর ১ হাজার কলম বিক্রির লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। তা থেকে আসবে আরো ৫০ হাজার টাকা। এ বারের লাভের টাকা দিয়ে বাগানের আকার আরো বাড়াবেন এমন পরিকল্পনা আছে তার।

বাগানের কোনো সমস্যা হলে মিশন-এর সহায়তায় স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অফিসে যোগাযোগ করে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেন। কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তারা এ বিষয়ে তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। এ ছাড়াও কৃষি মৌসুমে চাষাবাদের জন্য সম্পূরক কৃষি বা মৌসুমী ঋণও প্রদান করে মিশন। তাই চাষাবাদের জন্য পুঁজির চিন্তা আর নেই। তিনি বলেন, লেবু বাগান করতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। নিয়ম করে সার ও পানি দিতে হয়। নিয়মিত পরিচর্যা করতে হয়। তাছাড়া লেবুর কাটা ফুটে অনেক কষ্ট হয়। তার ওপর রয়েছে সাপের ভয়। বাগানে মাসে ৪ হাজার টাকার মতো খরচ হয়। এ সময় কিস্তির টাকাও শোধ করতে হয়। সব বাধা ঠেলেই সাবিনা তার স্বপ্ন পূরণের পথে এগিয়ে চলছেন। এখানেই থেমে থাকা নয়, এতো যাত্রা পথের শুরু কেবল, বলেন সাবিনা।

বর্তমানে সাবিনার সংসারে আগের মতো অভাব নেই। লেবু চাষ থেকে বাড়তি আয়ের অর্থে দু'টি গাভী ক্রয় করেছেন যা দিয়ে তিনি পরিবারের পুষ্টির চাহিদা মেটানোর পর সেগুলোর দুধ বিক্রি করে সংসারের কিছু বাড়তি আয় করেন। এ ছাড়াও বাড়িতে কিছু প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র কিনেছেন। বাড়ির আঙিনায় বসিয়েছেন টিউবওয়েল। ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার প্রয়োজনীয় খরচ যোগান দিতে এখন আর কোনো সমস্যা হয় না। তার স্বামী আলমগীর হোসেনও কৃষি কাজ করেন। তারা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলেই নিজেদের সংসার সুন্দর করার চেষ্টা করছেন। তার স্বামীও তার সঙ্গে বাগানে কাজ করেন।

স্বামী ও তিন সন্তান ও শাশুড়ীকে নিয়ে ৬ জনের ছোট পরিবার সাবিনার। তিন সন্তানের মধ্যে বড় মেয়ে পড়ে ৮ম শ্রেণিতে, বড় ছেলে ৪র্থ শ্রেণিতে আর ছোট ছেলে এখনো স্কুলে যাওয়া শুরু করেনি। সংসার থেকে সকল অভাব অনটন দূর করে আর দশজনের মতো পরিবারে সুখ, সাচ্ছন্দ ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন সাবিনা। নিজের সন্তানদের পড়ালেখা শিখিয়ে মানুষের মতো মানুষ করবেন এমন স্বপ্ন দেখেন সাবিনা। তিনি চান তার সন্তানেরা যেন তার মতো অভাব অনটনের মধ্যে না পড়ে। অভাব যেন তাদের মুখের হাসি কেড়ে না নেয়; তার জন্য চলছে এই নিরন্তর প্রচেষ্টা।

সফলতার অগ্রযাত্রায় শামিল এক তরুণ-রিয়াজুল

মোঃ ফারুক হোসেন, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার

ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। মাত্র ৩০ হাজার টাকা নিয়ে পাঁচ বছর আগে ২০০৯ সালে যাত্রা শুরু। তখন অনেকেই হয়তো ভাবেননি, এত ক্ষুদ্র আঙ্গিকে শুরু করেও এক সময় ঠিকই একাধিক পোল্ট্রি খামার গড়ে তোলা যাবে। কিন্তু হয়েছে তাই। একটি নয়, তিনটি খামার এবং ১৮টি খামারের ব্রয়লার ফিড, চিক্স, ভ্যাকসিন, ওষুধসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহের চুক্তিবদ্ধ উদ্যোক্তা এখন পুটিয়াখালীর টাউনকালিকাপুর গ্রামের এক সময়ের বেকার তরুণ রিয়াজুল ইসলাম। অনেক প্রতিকূলতা, অনেক সীমাবদ্ধতা সত্বেও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনসহ স্থানীয় কয়েকজনের ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠায়

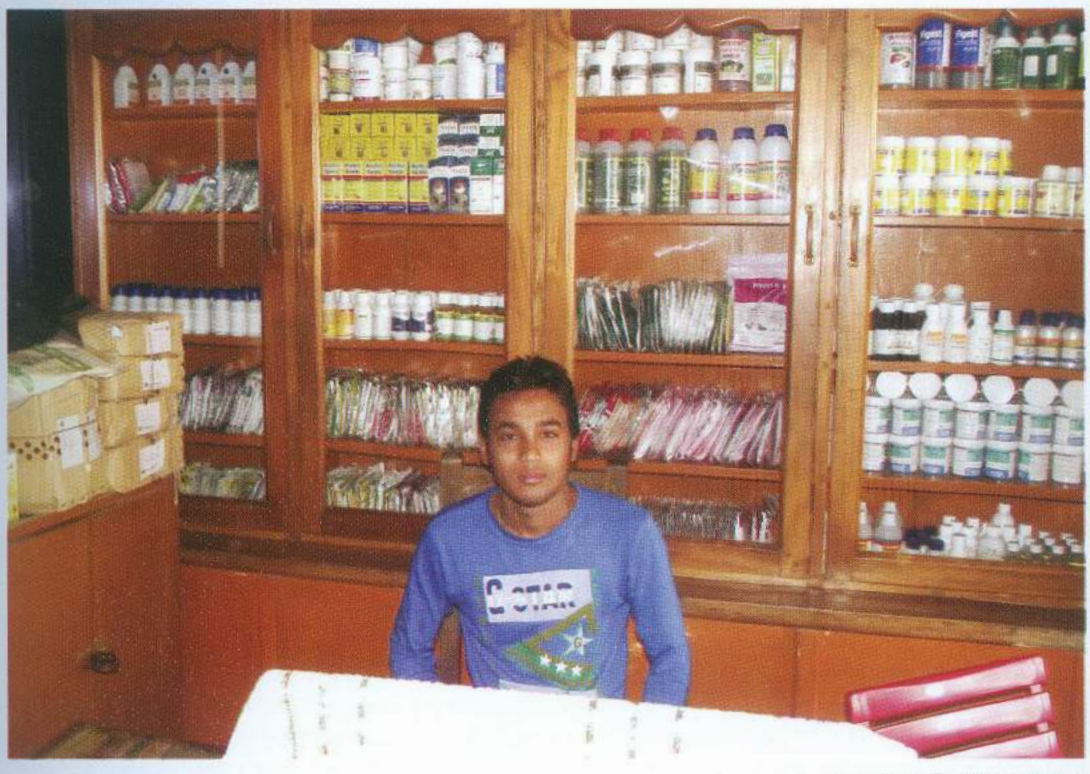

নিজের পোল্ট্রি সামগ্রীর দোকানে রিয়াজুল

রিয়াজুল বেকারত্ব ঘুচিয়ে শহরতলীতে গড়ে তুলেছেন এইসব খামার ও দোকান। তার দোকানে বিক্রি হয় ব্রয়লারের প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং নিজস্ব খামারে বাড়ন্ত ব্রয়লার মুরগি। এখন আরও অনেকদূর এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছেন রিয়াজুল।

তরুণ রিয়াজুলের বয়স যখন চার মাস, তখন তার বাবা হাবিবুর রহমান দ্বিতীয় বিয়ে করেন। ফলে মা উপায়ান্তর না দেখে তাকে নিয়ে নানার বাড়িতে চলে আসেন। সেই থেকে আজ অবধি সেখানেই বাস তাদের। বাবা থেকেও নেই। অন্যের বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ করে বাবার (নানা) সংসারে থাকলেও ৬ বছর বয়সে রিয়াজুলকে স্কুলে ভর্তি করে দেন তার মা। স্কুলে পড়ালেখা করলেও সংসারের দারিদ্রতা সবসময়ই পীড়া দিত রিয়াজুলকে। তাই কিছু করার তাড়না থেকেই ২০০৯ সালে এসএসসি পরীক্ষার পর স্থানীয় বড় ভাইদের পরামর্শে ভতি হন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে। সেখানে হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালনের বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এরপর যা হয়েছে তা তার জীবনে স্বপ্নের বাসতবায়ণ।

স্থানীয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নেয়ার পর পোল্ট্রি ফার্ম করার পরিকল্পনা করেন রিয়াজুল। তার এই পোল্ট্রি প্রকল্পে বিনিয়োগের প্রয়োজনীয় অর্থ-প্রাপ্তির জন্য রিয়াজুল টাউনকালিকাপুর হেতালিয়া বাধাঘাট সংলগ্ন ঢাকা আহ্ছানিয়া

মিশন কর্তৃক পরিচালিত পুরুষ সদস্যদের জন্য গঠিত "কাকলী ২৬ নং" সমিতিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ দিয়ে থাকে যার মধ্যে কৃষি, মৎস্য, পোল্ট্রি খামারসহ উৎপাদনমুখী খাতকে প্রাধান্য দেয়া হয়। মিশনের এ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অত্র এলাকার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা সফলতার মুখ দেখছে। রিয়াজুল মিশন থেকে ৩০ হাজার টাকা ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে এবং উত্তরাধিকার সুত্রে মায়ের পাওয়া কিছু জমি বিক্রি করে টাউনকালিকাপুরে ব্রয়লার মুরগি লালন-পালনের জন্য টিনের ঘর তৈরি করেন এবং এলাকার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নগদ ও বাকিতে বাচ্চা, খাদ্য, ভ্যাকসিন ও ওষুধ এনে মাত্র তিনশ বয়লার মুরগি দিয়ে খামারের কার্যক্রম শুরু করেন। তখন খুব একটা লাভ না হলেও হাল ছাড়েননি রিয়াজুল। ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন থেকে প্রতিবছর ঋণ নেন এবং পর্যায়ক্রমে খামারের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেন। শুরুতে মিশন থেকে তাকে ৩০ হাজার টাকা ঋণ দেয়া হলেও সঠিকভাবে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করায় প্রতিবছর ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। ২০১১ সাল পর্যন্ত লাভ-লোকসান নিয়ে ব্যবসার সম্প্রসারণ হলেও এরপর থেকে আর লোকসান হয়নি কখনও। এভাবে শূণ্য থেকে একে একে তিনটি খামার এবং "মেসার্স রিয়াজ পোল্ট্রি সেবা" নামে দুটি দোকান গড়ে তুলেছেন রিয়াজুল। আত্মীয়স্বজনসহ অনেকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে তার খামারে। বর্তমানে তার এই উদ্যোগটিকে কেন্দ্র করে স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে ২০ জন পুরুষ ও ২৫ জন মহিলা কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। পটুয়াখালী সরকারি কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগে অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র রিয়াজুলের জীবনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে 'স্বপ্ন-সিঁড়ি' ছোঁয়ার আকাঙ্ক্ষা। মায়ের স্বপ্ন পূরণের জন্য ব্যবসার পাশাপশি পড়াশোনাও চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

রিয়াজুল তার পোল্ট্রি ব্যবসায় অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে একটি বিপণন চক্র (মার্কেটিং চেইন) প্রতিষ্ঠা করে তার পোল্ট্রি প্রোডাক্টসমূহ বিপণন ও বাজারজাত করছেন। এজন্য তিনি স্থানীয় ক্ষুদ্র স্কেলে পোল্ট্রি উৎপাদনকারী ১৮ জন খামারীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। তার পোল্ট্রি খামার ও দোকান থেকে বাকিতে এই ১৮টি খামারে ব্রয়লার ফিড, বাচ্চা (চিক্স), ভ্যাকসিন, ওষুধসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা হয়। চুক্তি অনুসারে পরে টাকা ফেরত দেন এইসব খামারীরা। এখন তার একটাই আশা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। পাশাপাশি এই উদ্যোগকে আরও সম্প্রসারণের মাধ্যমে শতাধিক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এলাকার ও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক অবদান রাখা।

রিয়াজুল আজ সমাজে একজন সফল তরুণের নাম। দারিদ্র ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। রিয়াজুলের মা এখন আর অন্যের বাসায় গৃহকর্মীর কাজ করেন না। তিনি ছেলের পোল্ট্রি খামারে সহযোগিতা করেন। রিয়াজুলের পরিবারে আর্থিক সচ্ছলতা আসার পাশাপাশি সমাজে বেড়েছে গ্রহণযোগ্যতা। রিয়াজুলের উদ্যোমী ও উদ্যোগী মনোভাব এবং তার সফলতা এলাকার তরুণ সমাজকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাকে দেখে এলাকার অন্যান্য তরুণরাও তার মতো উদ্যোমী ও উদ্যোগী হয়ে এই ধরনের কর্মকাণ্ড হাতে নিচ্ছে।

রিয়াজুল তার জীবনের এই পরিবর্তনের পেছনে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অবদানের কথা স্মরণ করতে যেয়ে বলেন, তরুণ যুব সমাজই দেশের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। দেশের এই যুব সমাজকে জনসম্পদে পরিণত করতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও ঋণসেবা প্রদানের মাধ্যমে তাদের স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করছে। যার ফলে তার মতো আরও অনেক রিয়াজুল দারিদ্র ও বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমার মতো আরো অনেক সম্ভাবনাময় তরুণ শিক্ষিত বেকার রয়েছে, যাদেরকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে একদিকে যেমন তাদের আত্ম-কর্মসংস্থান হবে অন্যদিকে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে যুগোপযোগী পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে।

মোমের আলোয় আলোকিত শাপলার জীবন

বাঁধণ কুমার বিশ্বাস, এরিয়া ম্যানেজার

একটি চালাঘর। বোঝার উপায় নেই যে, এ ঘরের মধ্য দিয়েই যেতে হয় আরেকটি ঘরে। অর্থাৎ ঘর দুটি কিন্তু দরজা একটি। একটি শোবার ঘর। আরেকটি স্বপ্নের। প্রথমে ঢুকেই যে ঘরটি পড়বে সেটিই স্বপ্নের। আর এই ঘরকে ঘিরেই শাপলা বেগম রচনা করেন তার ভবিষ্যৎ। যেখানে রয়েছে পাঁচটি সক্রিয় মোমের ডাইস। প্রতিদিন ৪০০০-এর বেশি মোমবাতি উৎপাদিত হয় এখান থেকে। বাড়িতে, অফিসে, কারখানায় পৌঁছে গিয়ে সেস্থানগুলোকে আলোকিত করে এই মোমবাতি। শুধু অন্যকে নয়, আপন আলোয় আলোকিত হচ্ছেন শাপলা নিজেও; সাথে তার পরিবার। মোমবাতি

মোমবাতি তৈরি করছেন শাপলা বেগম

ব্যবসার মাধ্যমে শাপলা বেগম তার ভাগ্যকে ফিরিয়ে এনেছেন। তিনি এখন সমাজের অন্যতম সফল উদ্যোক্তা। নিজ এলাকায় আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য অন্যদের কাছে একজন অগ্রদূত বা সাফল্যের প্রতীক।

জীবন গড়ার প্রত্যয় নিয়ে ২০০৪ সালে শাপলা বেগম তার স্বামী ও সন্তানসহ রাজশাহী থেকে গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার বিশ্বাস পাড়া গ্রামে আসেন। একটু সচ্ছল জীবন-যাপনের জন্য তার স্বামী একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ নেন। যেখানে মাত্র ৪০০০ টাকা বেতন পেতেন। স্বামী-স্ত্রী ও একমাত্র সন্তান। ছোট্ট সংসার। তবে বাড়ি ভাড়া, খাওয়া-দাওয়া করে অতিরিক্ত বলতে আর কিছুই থাকতো না। এ কারণে শাপলা বেগম স্বামীর রোজগারের পাশাপাশি নিজেও কিছু কাজ করার কথা ভাবেন। দু'জনে মিলে উপার্জন করলে সংসার ভালোভাবে চলবে এবং ভবিষ্যতের জন্যও কিছু সঞ্চয় করা যাবে। স্বামীর সাথে পরামর্শ করে শাপলা বেগম মোমবাতির ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত নেন এবং নিজেদের গচ্ছিত সঞ্চয়ের টাকায় মোমবাতি তৈরির একটি ডাইস কিনে স্বামী-স্ত্রী যৌথভাবে মোমবাতি উৎপাদনের কাজ শুরু করেন। কিছুদিন চলার পর তাদের এ প্রচেষ্টা বেশি দূর এগুতে পারেনি। নানাবিধ সমস্যার কারণে বন্ধ করে দিতে হয় তাদের এই উদ্যোগকে। অগত্যা শাপলা বেগম ও তার স্বামী আনোয়ার হোসেন গ্রামের বাড়ি রাজশাহীতে ফিরে যান। সেখানে গিয়ে তার কাছে থাকা মোমবাতির ডাইস দিয়ে পুনরায় মোমবাতি তৈরি করা শুরু করেন। ৬ মাস চলতে থাকে

এভাবে। তারপর আবার ব্যবসায় মন্দা দেখা দেয়। গরমকালে ঐসব এলাকায় মোমবাতির যথেষ্ট চাহিদা থাকলেও শীতকালে তেমন চাহিদা থাকে না। অর্থাৎ ওখানেও ব্যবসা ছয়মাস স্থায়িত্বশীল হয়।

জীবিকার তাগিদে তারা আবার ফিরে আসেন গাজীপুরে। এবার অনেকটা আটঘাট বেধেই মোমবাতির ব্যবসায় নতুন করে যাত্রা শুরু করেন শাপলা বেগম। ইতোমধ্যে আরেকটি ডাইসও কিনে ফেলেন। ২০০৬ সালের কথা এটি। এই দু'টি ডাইস দিয়ে ২০১১ সাল পর্যন্ত তারা মোমবাতি তৈরি করেন। কিন্তু এ দিয়ে তাদের তেমন আয়-উন্নতি হচ্ছিল না। যা আয় হতো সে অর্থ দিয়ে সংসার চলতো কিন্তু বাড়তি কোনো টাকা থাকতো না। এমনকি তাদের ব্যবসায়ের পরিধি বাড়ানোর জন্য অর্থের জোগানও সম্ভব ছিলনা। এদিকে শাপলা বেগম এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে এসে এই মোমবাতি তৈরির ব্যবসাটিকে একটি সফল রূপ দেয়ার স্বপ্ন দেখতে থাকেন এবং ব্যবসাটিকে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করেন। এমতাবস্থায় তার সাথে পরিচয় হয় স্থানীয় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির উন্নয়ন কর্মীর সাথে। তিনি জানতে পারেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন থেকে নিয়মিতভাবে ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রসার ও নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য ক্ষুদ্রঋণ দেয়া হয়। স্বামীর সাথে পরামর্শক্রমে মিশন থেকে প্রথম দফায় ২৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে আরো একটি নতুন ডাইস কিনেন শাপলা বেগম। বাজারে মোমের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও তারা দু'জনে শুধুমাত্র আর্থিক অপ্রতুলতার কারণে এতদিন বেশি উৎপাদন করতে পারেননি। এবার মিশন থেকে ঋণপ্রাপ্তির ফলে সেই সুযোগ নাগালে চলে আসে। একটি নতুন ডাইসসহ ৩টি ডাইসে তাদের মোট উৎপাদন আনুপাতিক হারে বেড়ে যায়। ফলে রোজগারও আগের চেয়ে বেশ ভালো হতে থাকে। এ অবস্থায় এক বছর পেরিয়ে যায়। এরই মধ্যে শাপলা বেগম মিশন থেকে প্রথম দফায় গৃহীত ঋণের কিস্তির টাকাও পরিশোধ করেন। ব্যবসার পরিধি আরো বৃদ্ধির জন্য দ্বিতীয় দফায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন থেকে ৪৫,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন তিনি। এ টাকা দিয়ে আরো একটি ডাইস কিনেন শাপলা বেগম। এতে তার মোট ডাইসের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪টি। এভাবে পরবর্তী বছরে শাপলা বেগম দ্বিতীয় দফায় গৃহীত ঋণের কিস্তির টাকাও পরিশোধ করেন। ২০১৩ সালের শেষের দিকে তার মোট ডাইসের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫টি। এবছর শাপলা বেগম তৃতীয় দফায় ৬০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়েছেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি থেকে।

২০১১ সালে শাপলা বেগম বাজারে প্রতিদিন ২৪০০ পিছ মোমবাতি সরবরাহ করতে পারতেন। বর্তমানে বাজার চাহিদা মেটানোর জন্য তাকে প্রতিদিন ৪ হাজারেরও বেশি মোমবাতি উৎপাদন করতে হয়। তার এই কারখানা থেকে ৪ প্রকারের মোমবাতি তৈরি হয়। বিদ্যুতের বিকল্প হিসেবে ব্যবহারের জন্য সাধারণ জ্বালানি মোমবাতি উৎপাদন করার পাশাপাশি বিশেষ উপলক্ষ্য যেমন, জন্মদিন এবং পূঁজার জন্য নানা ধরনের রঙিন মোমবাতিও উৎপাদন করেন শাপলা বেগম। এ ছাড়াও গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে সোয়েটারের ওপর পলিশ করার জন্য বিশেষ ধরণের মোম তৈরি করতে হয় তাকে। এ ৪ ধরনের মোমবাতির মধ্যে গার্মেন্টস পোশাকের জন্য মোম বেশি লাভজনক। কিন্তু ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও ব্যাপকভাবে এই খাতে তিনি বিনিয়োগ বাড়াতে পারছেন না। তবে এ বছরই ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন থেকে বড় অংকের ঋণ নিয়ে এই খাতে তিনি বিনিয়োগ বাড়াবেন বলে ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

প্রতিদিন সকালে মোমবাতি তৈরির কাজ দিয়ে শুরু হয় শাপলা বেগমের পথ চলা। শাপলা বেগম ও তার স্বামী আনোয়ার হোসেন সকাল ১০টার মধ্যে তৈরি করে ফেলেন চার হাজারের ওপর মোমবাতি। এরপর বাজারে সরবরাহ। শুধুমাত্র বিদ্যুতের বিকল্প হিসেবে সাধারণ ব্যবহারের জন্য জ্বালানি মোমবাতি তৈরি করে শাপলা বেগমের বর্তমান মাসিক আয় ২৫ হাজার টাকা। এই মোমবাতি তৈরির জন্য শাপলা বেগমের স্বামী আনোয়ার হোসেন ঢাকার চকবাজার থেকে মোম কিনে নিয়ে আসেন। অনেক সময় তিনি নিজে এসেও কিনে নিয়ে যান; আবার অনেক সময় ফোনে অর্ডার দিলে মোম বাসায় পৌঁছিয়ে দিয়ে যায়।

শাপলা বেগম তাঁর আজকের অবস্থানে বেশ সন্তুষ্ট। তিনি তার স্বামী ও সন্তানকে নিয়ে এখন অনেক স্বপ্ন দেখেন। তিনি প্রস্তুতি নিচ্ছেন মোমবাতি ব্যবসার পাশাপাশি একটি চানাচুরের ডাইস কিনে চানাচুরের ব্যবসা শুরু করার। সাথে কলম তৈরির ডাইস কেনারও চিন্তা ভাবনা আছে। এই প্রচেষ্টাগুলোর মাধ্যমে শাপলা বেগম তার ব্যবসাকে একটি প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার চেষ্টা করছেন, যেখানে অনেক দরিদ্র ও বেকার নারী-পুরুষের কর্মের সংস্থান হবে, বাড়বে তার উৎপাদন। এছাড়াও তার একমাত্র সন্তানকে একটি সুন্দর আগামী দিতে চান শাপলা বেগম।

পান চাষের মাধ্যমে স্বাবলম্বী আছিয়া খাতুন

মোঃ সেলিম হোসেন, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার

আছিয়া খাতুন (৫০)। পড়া-লেখা জানেন না। কখনও পড়া-লেখার চেষ্টা করেননি। তবে, নিজের স্বাক্ষর কোনভাবে শিখে নিয়েছেন। ওই পর্যন্তই। বয়সেরও শেষ দিকে, তাই এ নিয়ে মাথা ব্যাথাও নেই। সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ থানার বুরুজ পাটুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা আছিয়া খাতুন পানের বরজে পান চাষ করে এলাকায় এখন সফল পান চাষী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। বর্তমানে তিনি স্বামী ফজল আলী ও ছেলে আছাদুল ইসলাম (৩২), শহীদুল ইসলাম (২৮) এবং মেয়ে শরীফা খাতুনকে (২৫) নিয়ে সুখেই বসবাস করছেন। অথচ একটা সময় ছিল যখন খুব কষ্টে পরিবার পরিজন নিয়ে কোনো রকমে দিনাতিপাত করতেন আছিয়া খাতুন। পরিবারে অভাব লেগেই থাকতো। পরিবারের

নিজের পানের বরজে আছিয়া খাতুন

উপার্জনের সঠিক কোনো পথ ছিলো না। তাই ভাগ্যকে ফেরাতে জমি বিক্রি, ধার-দেনা করে ছেলে শহীদুল ইসলামকে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু বিধি বাম। দালালের খপ্পরে পড়ে ভাগ্যের চাকাতো ঘুরলোই না উল্টো সব খুইয়ে দেশে ফিরে আসে ছেলে শহীদুল। ছেলে শহীদুল দেশে ফিরে আসায় পূর্বের ধার-দেনা পরিশোধ করতে না পেরে নতুন করে আরো ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে আছিয়া খাতুন ও তার পরিবার। তারপরও দমে যাননি এই আছিয়া খাতুন। এখান থেকেই ভাগ্যকে বদলের সংগ্রাম শুরু করেন তিনি।

নিজের এবং পরিবারের জীবিকা পুনরুদ্ধার ও আত্মনির্ভরশীল হওয়ার প্রত্যয় নিয়ে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালিত বুরুজ পাটুলিয়া গ্রামের দোলন চাপা মহিলা উন্নয়ন সমিতিতে ২০০৭ সালে আছিয়া খাতুন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হন। প্রথমাবস্থায় তিনি মিশন থেকে ৩০ হাজার টাকা ঋণ এবং পারিবারিক উৎস থেকে কিছু টাকার পুঁজি সংগ্রহ করে তা দিয়ে ৫০ শতাংশ জমির ওপর পানের বরজ স্থাপন করেন। প্রথম বছর খুব একটা লাভের মুখ না দেখলেও সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে আছিয়া খাতুনের ভাগ্যেরও পরিবর্তন হয়। স্বামী

ফজল আলী, ছেলে আছাদুল, শহীদুলের সাথে নিজেও বরজে কাজ করেন। ব্যবসায় কিছুটা উন্নতি হওয়ায় পরবর্তী বছর থেকে আছিয়া খাতুন আহ্ছানিয়া মিশনের স্থানীয় শাখা ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে ঋণ বাড়িয়ে ৫০ হাজার টাকা নেন। এভাবে ৭০ হাজার, ১ লক্ষ, ১ লক্ষ ৩০ হাজার এবং বর্তমানেও ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন।

ঋণের সাথে সাথে বেড়েছে আছিয়া খাতুনের বরজে পান চাষের জমিও। এখন প্রতিমাসে পান বিক্রয়ের টাকা থেকে সংসারের খরচ মিটিয়ে তিনি ১৩ হাজার টাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্থানীয় শাখায় ঋণের কিস্তি পরিশোধ করেন। এছাড়াও পানের বরজের পাশাপাশি ৫ বিঘা জমিতে মাছের ঘের স্থাপন করে আছিয়া বেগম তার ব্যবসার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করেছেন। লাভের টাকায় গড়ে তুলেছেন ইটের দেয়াল ঘেরা সুদৃশ্য একটি বাড়ি। বড় ছেলে আছাদুলকে পুনরায় বিদেশ পাঠিয়েছেন। এছাড়া এ বছর দেড় বিঘা জমি ক্রয় করেছেন। একই সঙ্গে প্রতিবছর এক বিঘা জমি কেনার কথা ব্যক্ত করেন তিনি। এখানেই শেষ নয়; পান চাষের জন্য জমি বন্ধক নিয়েছেন ৮ বিঘা। প্রতিদিন ২/৩ জন শ্রমিক কাজ করে এখন তার পানের বরজে। এছাড়া আষাঢ় মাসে প্রতিদিন ৮/১০ জন শ্রমিক কাজ করে বলেও উল্লেখ করেন আছিয়া থাতুন। তার বরজের পান বর্তমানে ৪০ টাকা থেকে ৮০ টাকায় বিক্রি করছেন। এদিকে পানের বরজে শুধু পান চাষই নয়; পাশাপাশি মিষ্টি আলু, পুঁইশাক, লাউ, পেঁপে, পটল, মরিচ, আদা, হলুদ, এবং সুপারি চাষ করেন বলে জানান আছিয়া খাতুন। আর এ থেকেও দৈনন্দিন চাহিদা মিটিয়ে ভালো একটা অর্থও উপার্জন করছেন তিনি।

আর এভাবেই বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণ প্রকল্পের সহযোগিতায় আছিয়া খাতুন নিজের ভাগ্যের পরিবর্তনতো করেছেনই, এখন এলাকার অন্যদেরও ভাগ্য পরিবর্তনের দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন। এলাকার লোকজন এখন তার এবং তার পরিবারের কাছ থেকে পরামর্শ নেন বরজে পান চাষ সম্পর্কে।

আছিয়া খাতুন বলেন, বর্তমানে আমি এবং আমার পরিবার অনেক ভালো আছি। এর পেছনে মূল চালিকাশক্তি আমাদের পরিশ্রম এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহযোগিতা। সময়মতো মিশনের সহায়তা না পেলে এ পর্যন্ত আসা সম্ভব হতো না। একই সঙ্গে তিনি ছেলে, স্বামী এবং পাড়া-প্রতিবেশীর সাহায্যের কথা স্মরণ করেন। তিনি জানান, স্বামী, ছেলে-মেয়েকে নিয়ে সবাই ভালো আছি। বড় ছেলে আছাদুল বিদেশে আছে, মেয়ে শরীফাকে ভাল ঘরে বিয়ে দিয়েছেন। ছোট ছেলে এবং স্বামী পানের বরজ দেখাশুনা করেন। বরজ থেকে প্রতিমাসে সব খরচ বাদ দিয়েও প্রায় ২০ হাজার টাকা থাকে বলে জানালেন আছিয়া খাতুন। এখন ভালো মেয়ে দেখে ছেলেদেরকে বিয়ে করানোর চিন্তা করছি। তবে, অন্যান্য ফসলের চেয়ে তুলনামূলক কম খরচে গড়ে তোলা পান বরজের যথেষ্ট যত্ন নিতে হয় বলে জানান আছিয়া খাতুন। একই সঙ্গে এর পেছেনে সার্বক্ষণিক লেগে থাকতে হয় বলেও উল্লেখ করেন।

বুরুজ পাটুলিয়া এলাকার মানুষের মতে, আছিয়া খাতুন এবং তার পরিবার দারিদ্রকে জয় করার এক অভিনব উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন সমাজের জন্য। পানের বরজের মাধ্যমে তারা অনেক সফলতা পেয়েছেন। এলাকার অনেকেই এখন আছিয়া খাতুন এবং তার ছেলে শহীদুলের কাছ থেকে দিকনির্দেশনা নিয়ে পানের বরজ করছে। সফলতাও পাচ্ছে। আর এ কারণে এখন এলাকার অনেকেই পানের চাষের দিকে ঝুঁকছেন।

বাঁশ-বেতে সচ্ছলতার ভিত গড়ছেন ঊষা রানী

মোঃ নিয়ামুল কবির, প্রোগ্রাম অফিসার (কৃষি)

বাঁশ-বেতের সামগ্রী তৈরি করে অভাবকে জয় করেছেন ঊষা রানী। ঝুঁড়ি, ডালা, টেপারি, ডোল, কুলা, টোপর ঊষা রানীর সংসারে জ্বালিয়েছে সুখের প্রদীপ। বাঁশ-বেতের ওপর ভর করেই সচ্ছলতার ভিত গড়ে যাচ্ছেন ঊষা রানী। ১৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে শুরু করা এ শিল্প ঊষা রানীকে দিয়েছে আর্থিক সচ্ছলতা। তার সফলতায় প্রতিবেশীরাও জীবন-জীবকার চাহিদা পূরণে বেছে নিচ্ছেন বাঁশ-বেতের এ শিল্পকে। সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ছয়ঘরিয়া গ্রামের ঊষা রানী এখন বাঁশ-বেত শিল্পে অনুকরণীয় এক নাম।

সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ছয়ঘরিয়া গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে ঊষা রানীর জন্ম। গ্রামের আর ১০টি ছেলেমেয়ের মতো বেড়ে উঠা হয়নি ঊষা রানীর। দরিদ্র পরিবারে জন্ম হওয়ায় মাত্র ১৩ বছর বয়সেই পাশের গ্রামের সুপদ দাসের

পরিবারের সদস্যদের সাথে বাঁশ-বেতের সামগ্রী তৈরি করছেন ঊষা রানী

সাথে বসতে হয়েছিল বিয়ের পিঁড়িতে। স্বামী সুপদ দাসের সংসারেও অভাব তার পিছু ছাড়েনি। অভাব-অনটনের সংসারে পর্যায়ক্রমে জন্ম নেয় চার সন্তান। সংসারে সদস্য সংখ্যা বাড়লেও বাড়েনি আয়। এ অবস্থায় স্বামীর একার রোজগারে সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ ও সংসার চালানো দুরূহ হয়ে পড়ে। অভাব আরও প্রকট হয়ে সংসারে জেঁকে বসে। এ অবস্থার পরিবর্তন আনার জন্য ঊষা রানী বিকল্প উপার্জনের কথা চিন্তা করতে থাকেন। ঊষা রানী ছোটবেলায় তার বাবার কাছ থেকে বাঁশ ও বেতের কাজ শিখেছিলেন। তৈরি করতে পারতেন বাঁশ ও বেতের নানা রকম সামগ্রী। ঊষা রানী ভাবলেন তার এ দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে বাঁশ-বেতের সামগ্রী তৈরি করে বাজারজাত করলে সংসারের উপার্জন বৃদ্ধি করা সম্ভব। ঊষা রানী স্বামীর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। স্বামী তাকে এ কাজে সহায়তার আশ্বাস দিলে ঊষা রানী বাঁশ-বেতের কাজটি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় পুঁজি। স্বামীর বর্তমান পুঁজিতে এ কাজ শুরু করা সম্ভব ছিল না। এ অবস্থায় পুঁজি সংগ্রহের নানা উপায় খুঁজতে থাকেন ঊষা রানী। এ সময় এক প্রতিবেশীর সহায়তায় আশার আলো দেখতে পান তিনি। যুক্ত হন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত মাধবকাটি ব্রাঞ্চ অফিসের স্বর্ণলতা মহিলা দলের সঙ্গে। পরবর্তী সময়ে নিয়মকানুন জেনে

স্বর্ণলতা মহিলা দলের সদস্য হিসেবে ভর্তি হন তিনি। প্রতি সপ্তাহে ১০ টাকা করে সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। এরপর প্রথম দফায় ১৫ হাজার টাকা গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করে বাঁশ-বেতের কাজ শুরু করেন। প্রথম দিকে স্বামী এলাকা এবং বাজার থেকে বাঁশ কিনে আনে। তারপর বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে বাঁশ-বেতের সামগ্রী তৈরি করে। উৎপাদিত সামগ্রী তার স্বামী স্থানীয় বাজারে নিয়ে বিক্রয় করে। প্রথম দিকে তাদের লাভ কম হলেও আস্তে আস্তে তাদের উৎপাদিত সামগ্রীর চাহিদা বাড়তে থাকে। উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের বাঁশ-বেতের সামগ্রী বিক্রি করে যে লাভ হয় তা দিয়ে সংসারের পরিচালনা ব্যয় এবং ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে কোনোরকম সমস্যা হয় না।

মানুষের স্বপ্ন থাকে অনেক, সাধ্যের মধ্যে থাকা স্বপ্নগুলো পূরণে চাই বিশ্বস্ত কারও পৃষ্ঠপোষকতা, অনুকূল পরিবেশ আর প্রয়োজনীয় সহায়তা। ঊষা রানীর স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে আসে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। কৃষি প্রধান সাতক্ষীরা এলাকায় বাঁশের তৈরি সামগ্রীর ব্যাপক চাহিদা থাকা, কাঁচামালের সহজলভ্যতা এবং উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাওয়ায় এ কাজের মাধ্যমে ঊষা রানী সংসারে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন। বাঁশ-বেতের কাজ করে তার আয় থেকে ঊষা রানী ৫ কাঠা জমি ক্রয় করেছেন। নিজেদের থাকার জন্য আধাপাঁকা টিনশেড ঘর তৈরি করেছেন। এ কাজের আয় দিয়েই ঊষা রানী তার ছেলেদের পড়া-লেখা করিয়ে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চান। তার বড় ছেলে পবিত্র দাস এ বছর এইচএসসি পরীক্ষা দেবে। অন্য ছেলেদের মধ্যে পলাশ ১০ম শ্রেণি, বিপ্লব ৬ষ্ঠ শ্রেণি ও ছোট ছেলে সজীব ২য় শ্রেণিতে পড়া-লেখা করছে।

ঊষা রানীর বাঁশ-বেতের এ কাজে প্রথম দিকে সফলতা না এলেও হাল ছাড়েননি তিনি। বেচা-বিক্রি কম হলেও কাজটি চালিয়ে যেতে থাকেন। এরই মাঝে একদিন ঝাউডাঙ্গার এক কুটির শিল্পের আড়তদারের সঙ্গে ঊষা রানীর যোগাযোগ করিয়ে দেন মিশন কর্মী। আড়তদার ঊষা রানীর তৈরি করা ঝুড়ি, ডালা, টেপারি, ডোল, কুলা, টোপর ইত্যাদি পছন্দ করেন। আড়তদার এসব সামগ্রী ন্যায্যমূল্যে ক্রয়ের আশ্বাস প্রদান করেন। এ আশ্বাস ঊষা রানীর স্বপ্নকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। তিনি দ্বিগুণ আগ্রহ নিয়ে মনের মাধুরী মিশিয়ে বাঁশের ঝুড়ি, ডালা, টেপারি, ডোল, কুলা, টোপর ইত্যাদি তৈরি করতে থাকেন। অল্পদিনেই তার কাজের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় পাইকাররা বাড়ি থেকেই ঊষা রানীর তৈরি বাঁশ-বেতের সামগ্রী ন্যায্যমূল্যে কিনে নিয়ে যেতে থাকে। দিনে দিনে বাড়তে থাকে তার কাজের চাহিদা। বাড়তে থাকে আয়। ঊষা রাণীর স্বামী সুপদ দাসের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, অভাব যখন সংসারের নিত্যদিনের সাথী তখনই তার স্ত্রী ঊষা রানী আয়-উপার্জন বৃদ্ধির জন্য বাঁশ বেতের জিনিস তৈরির উদ্যোগ নেয়।

একটি বাঁশের দাম ১০০ টাকা থেকে ১২০ টাকা। বাঁশ পরিবহনে ভ্যান ভাড়া, তার মজুরি ও সুতলি ক্রয় বাবদ আরও খরচ হয় ৪০ থেকে ৫০ টাকা। একজন মানুষ একদিনে একটি বাঁশ দিয়ে ৬ থেকে ৭ টি সামগ্রী তৈরি করতে পারে। এ হিসাবে একটি বাঁশ থেকে তৈরি করা সামগ্রী বিক্রি করে একজন মানুষ সব খরচ বাদ দিয়ে প্রতিদিন ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা আয় করতে পারে। ঊষা রানীর এ কাজে ৫-৬ জন লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

ঊষা রানীর ভবিষ্যত স্বপ্ন স্বামী-স্ত্রী মিলে বাঁশ-বেতের একটি কুটির শিল্প গড়ে তোলা। তিনি আরও স্বপ্ন দেখেন ছয়ঘরিয়া ঋষি পল্লীতে বসবাসরত ২৫টি পরিবারকে এ পেশায় সম্পৃক্ত করার। তার ধারণা, সবাই মিলে এক সঙ্গে কাজ করলে বড় একটি বাজার সৃষ্টি হবে। শহর থেকে ব্যবসায়ীরা এসে সঠিক মূল্যে কিনে নিয়ে যাবে তাদের তৈরি করা উৎপাদিত সামগ্রী। আর এ স্বপ্ন বাস্তবায়ন হলে ২৫টি পরিবারেই ফিরে আসবে আর্থিক সচ্ছলতা।

জীবিকায়নের চিত্র

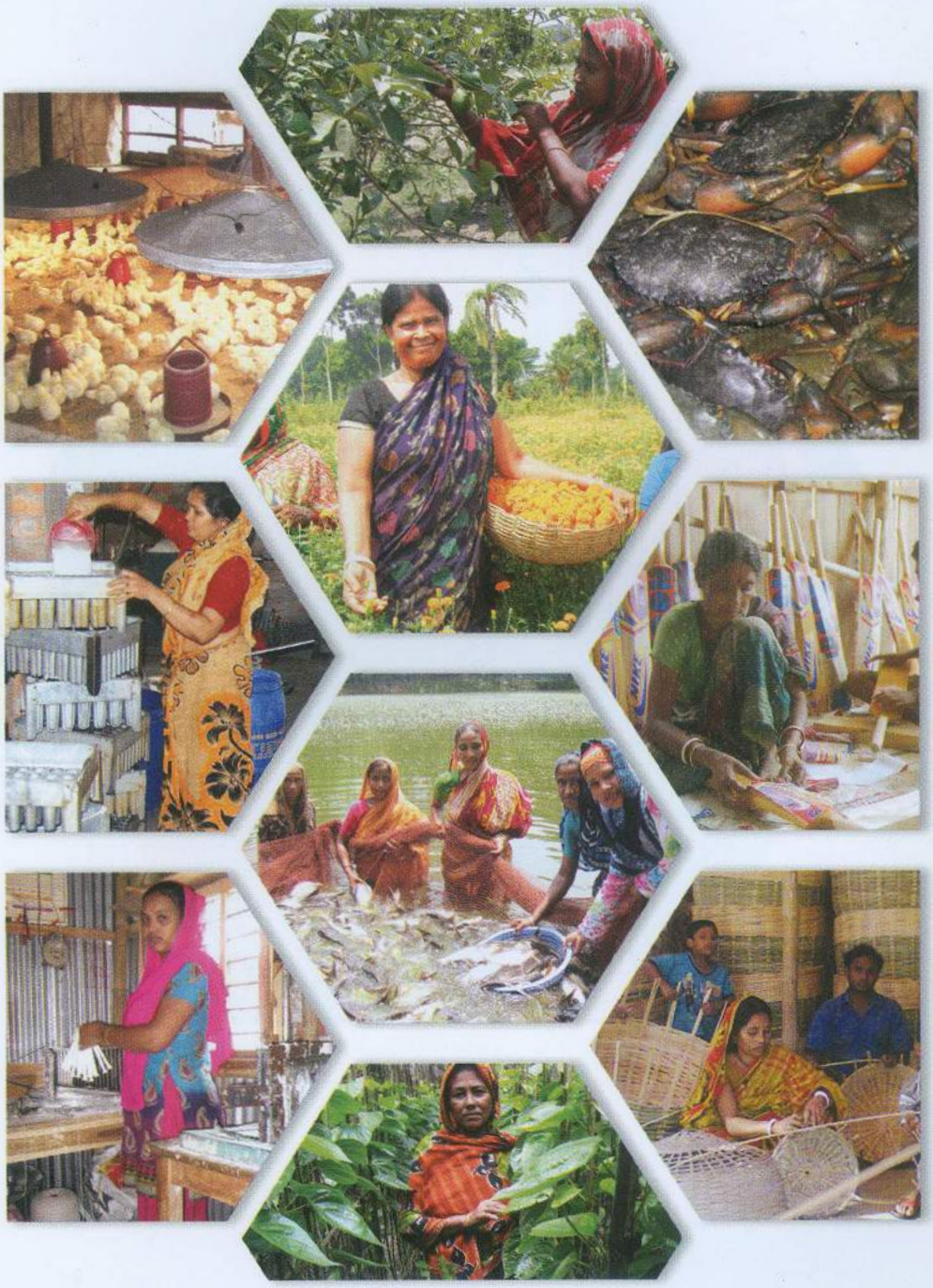

ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)
বাড়ি # ১৯, সড়ক # ১২ (নতুন), ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮১১৯৫২১-২২, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০
ফ্যাক্স ঃ (৮৮০-২) ৮১১৩০১০, ৯১৪৪০৩০
E-mail : dam.bgd@ahsaniamission.org
Website : www.ahsaniamission.org.bd